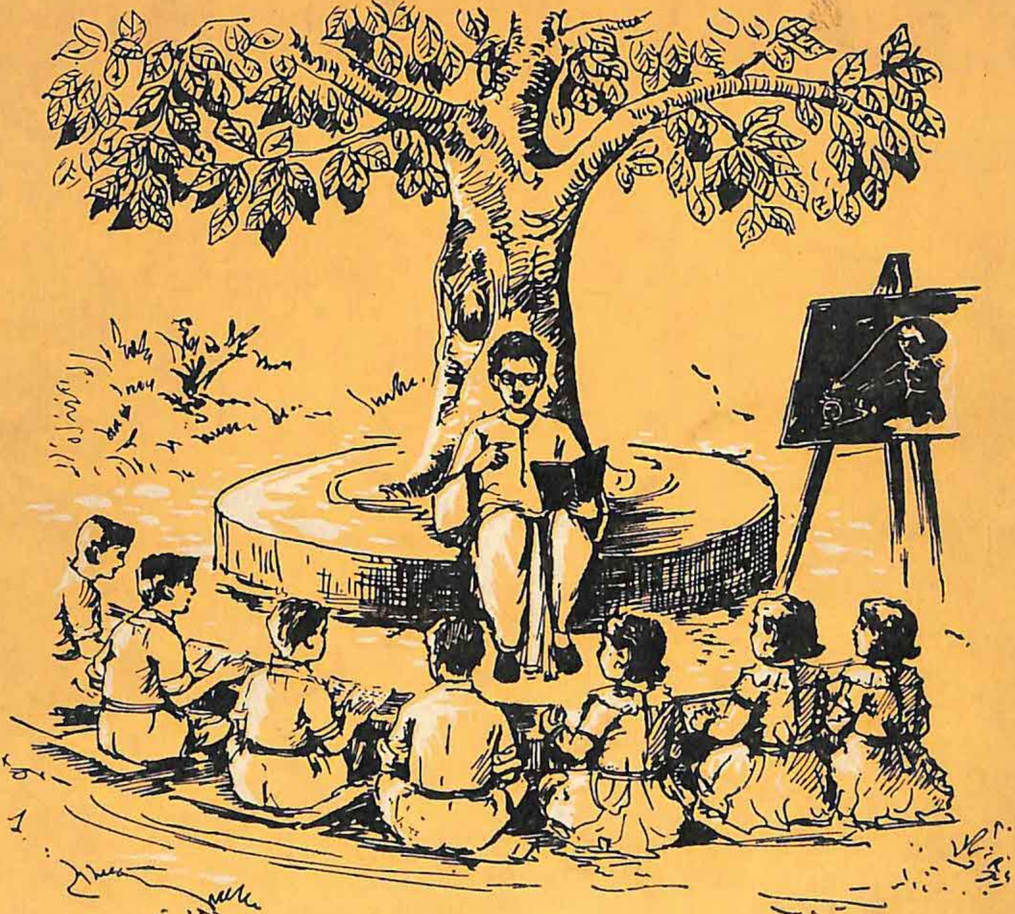
অনুশীলনে

বাংলা ব্যাকরণ ও রচনা

দ্বিতীয় ভাগ



শ্রীসুধীরচন্দ্র রায়

ওরিয়েন্ট লংম্যান লিমিটেড

অনুশীলনে
বাংলা ব্যাকরণ ও রচনা

[দ্বিতীয় ভাগ ॥ ষষ্ঠ শ্রেণীর জন্য]

শ্রীসুধীরচন্দ্র রায়
অধ্যাপক ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ
কলিকাতা

ওরিয়েন্ট লংম্যান লিমিটেড
বোম্বাই ॥ কলিকাতা ॥ মাদ্রাজ ॥ নয়াদিল্লী

ওরিয়েণ্ট লংম্যান লিমিটেড্
রেজিস্টার্ড অফিস : ৩/৫ আসফ আলী রোড, নয়াদিল্লী ১

আঞ্চলিক অফিস :
নিকল রোড, ব্যালার্ড এস্টেট, বোম্বাই ১
১৭ চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ, কলিকাতা ১৩
৩৬এ মাউণ্ট রোড, মাদ্রাজ ২
বি-৩/৭ আসফ আলী রোড, নয়াদিল্লী ১

প্রথম প্রকাশ : জুলাই ১৯৭২
দাম চার টাকা

মুদ্রক : শ্রীবাণেশ্বর মুখার্জী
কালিকা প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
২৫ ডি. এল. রায় স্ট্রীট, কলিকাতা-৬
প্রকাশক : শ্রীরবীন্দ্রনাথ দাশ, রিজিওন্যাল ম্যানেজার,
ওরিয়েণ্ট লংম্যান লিমিটেড, কলিকাতা-১৩

ভূমিকা

দ্বিতীয় ভাগে ব্যাকরণ ও রচনার কয়েকটি দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। যেমন, অর্থবোধ, উচ্চারণস্থান ও সন্ধি, শব্দগঠন, চিঠিলেখা ও রচনা। অর্থবোধের মধ্যে সাধারণ দিক ছাড়াও আছে কারক, পদ-পরিচয় ও লিঙ্গার্থ নির্ণয়।

সমস্ত আলোচনার একটিমাত্র উদ্দেশ্য—রচনা করায় অভ্যস্ত করানো। ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের বয়স অনুযায়ী সহজ-বোধ্য এবং সহজ-সাধ্য করে বিষয়গুলি আলোচনা করা হল। উচ্চারণ স্থান এবং সন্ধি-প্রকরণ সাধারণত প্রত্যক্ষভাবে ধ্বনির অভ্যাসের মধ্য দিয়ে আলোচনা করতে হয়। লিখিত পুস্তকে মৌখিক সেই অভ্যাস গঠন করানো কঠিন। তাই সন্ধি-প্রকরণের কাজ বেশীদিন ধরে বেশি করে অনুশীলন করানো উচিত। সন্ধি-প্রকরণ, চিঠিলেখা ও রচনাংশ বাদ দিলে অন্যগুলি অভ্যাস করাতে ৩০ দিনের বেশি লাগবার কথা নয়। অথচ এইগুলি না-করালে ভাষাবোধ হওয়া কঠিন। এইসব অনুশীলনে চতুর্থশ্রেণীর মধ্যে তারা অঙ্ক, ভূগোল, বিজ্ঞান ও প্রকৃতি-পরিচয়ের যে-সব দিক শিখেছে সেই সব বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই অনুশীলনে সেই সব বিষয়ের শিক্ষাও এগিয়ে যাবে।

এই শ্রেণীতে চিঠিলেখা আর রচনালেখা অনেকটা একই ধর্মের করে আনা হয়েছে; কারণ এই বয়সের ছেলেমেয়ে যে-কোন লেখাতেই একটু ব্যক্তিগত চিন্তা প্রয়োগ করতে চায়। আনুষ্ঠানিক-ভাবে পুরনো রীতি মেনে যুক্তিবিন্যাস করে রচনা লেখার দিনও যেমন আর নেই, এই বয়সে তা সম্ভবও নয়।

সূচীপত্র দেওয়া হল না, কারণ প্রথম থেকেই অনুশীলন করানো উচিত। পাঠক্রম ৬০টি পাঠে বিভক্ত করে সাজানো হয়েছে।

অনুশীলনী প্রয়োগে আমাকে সাহায্য করেছে শ্রীমান সব্যসাচী ও শ্রীমান সবিতাব্রত রায়।

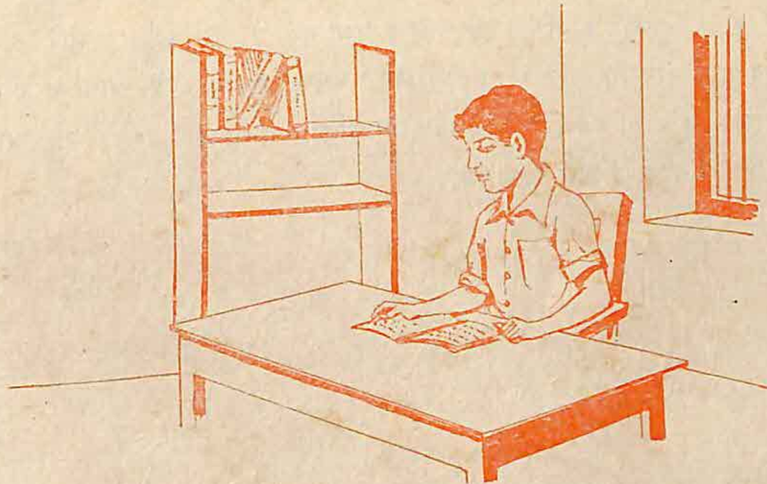
ওরিয়েণ্ট লংম্যানের প্রকাশন বিভাগ এবারেও এই পুস্তক প্রকাশে যেরূপ যত্ন নিয়েছেন তার জন্য তাঁদের কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

কলিকাতা
জুন, ১৯৭২

শ্রীসুধীরচন্দ্র রায়

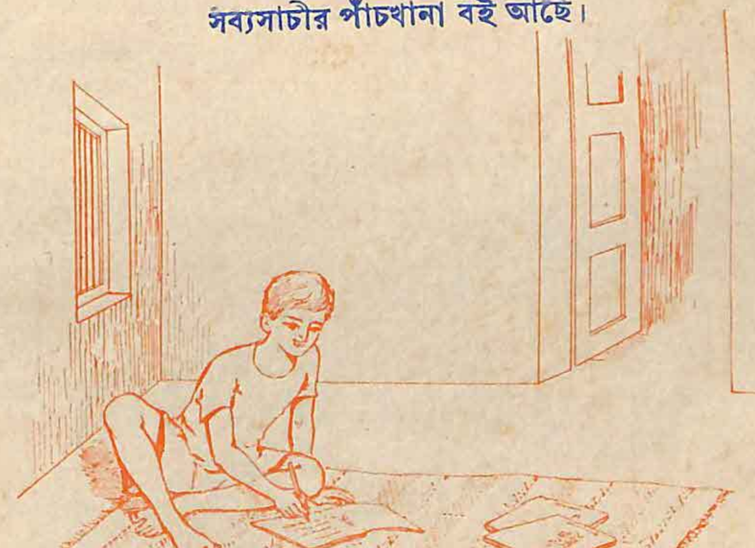
অর্থবোধ

॥ ১ ॥



১

সব্যসাচীর পাঁচখানা বই আছে।



২

সে খাতায় লিখছে।

প্রথম পাতায় ছবি দুটির নীচে দুটি 'বাক্য' লেখা। নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর এমনি করে বাক্যে সাজিয়ে লেখ : একটি প্রশ্নের উত্তর করতে কখনও দু-একটি বেশী বাক্যও লিখতে হতে পারে।

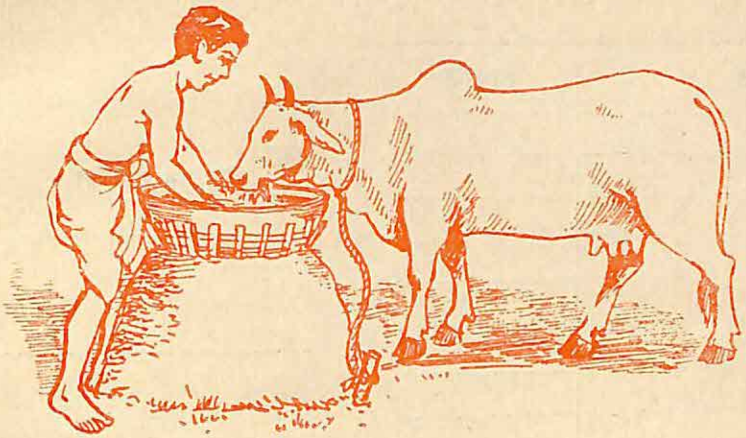
১। প্রথম ছবিটিতে সব্যসাচী কী করছে ? ২। তাকের মধ্যে ক'খানা বই সাজানো ? ৩। সব্যসাচী ক'খানা বই পড়ছে ? ৪। পরের ছবিতে ছেলেটি কি ভাবে লিখছে ? ৫ তার কয়খানা খাতা। ৬। দ্বিতীয় ছবিটিতে ছেলেটিকে 'সে' বলা হয়েছে, এই ছেলেটি যদি উপরের ছবির ছেলেটিই হয় তবে তার নাম কি হবে ? সব্যসাচীর সবশুদ্ধ ক'খানা বই আর ক'খানা খাতা আছে ? ৮। তোমার নিজের ক'খানা বই ? ৯। ক'খানা খাতা তোমার ? ১০। বই আর খাতা একসঙ্গে মিশে গেছে ; তুমি কি করে সেগুলি চিনে নেবে ?



৩



৪



৫



৬

৩, ৪, ৫ ও ৬ নং ছবি দেখে উত্তর লেখ :

১১। বাঘ দেখে কাঠুরেরা পালাচ্ছে কেন ? ১২। কাঠুরেরা সাধারণত কি কাজ করে ? ১৩। গোরু মানুষের কি কি উপকারে লাগে ? ১৪। বাঘ কোথায় থাকে ? ১৫। গোরু সাধারণত কোথায় থাকে ? ১৬। গোরু তো নিজেই মাঠে গিয়ে ঘাস খেতে পারে, তবে তাকে বিশেষ করে লোকে খড় বিচুলি খেতে দেয় কেন ? ১৭। বাঘকে যদি বন্য পশু বলা যায়, তবে গোরুকে কিরূপ পশু বলা যাবে ?

বাঘ আর গোরুর বিবরণ নীচের নির্দেশ অনুসারে লেখ ঃ

প্রাণীর নাম	আকৃতি	প্রকৃতি
বাঘ		
গরু		

উভয়ের পার্থক্য

আগের মতো ছক কেটে জোড়া শব্দগুলির 'আকৃতি' 'প্রকৃতি' এবং 'উভয়ের পার্থক্য' লেখ ঃ

১। বৃক্ষ	ঃ	লতা	৪। আগুন	ঃ	জল	৭। টেবিল	ঃ	চেয়ার
২। কাক	ঃ	চিল	৫। সহর	ঃ	বন	৮। ফুল	ঃ	পাতা
৩। নদী	ঃ	সমুদ্র	৬। কলম	ঃ	পেন্সিল	৯। স্কুল	ঃ	বাড়ী

॥ ২ ॥



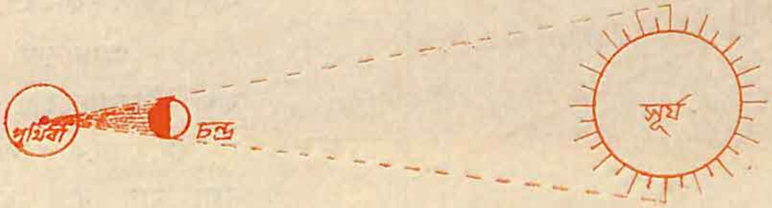
(৭)

১। মেয়েটি মাছ নিয়ে কি করছে ? ২। আমরা বাঙালীরা সাধারণত কি কি খাই ? ৩। মানুষে খাদ্য গ্রহণ করে কেন ? ৪। মাছ কোথায় বাস করে ? ৫। ধান আর গম আমরা কোথায় চাষ করি ? ৬। চাষীর সঙ্গে জমিদারের সম্পর্ক কি ? ৭। কারখানার মালিকেরা কি ধরণের দ্রব্য তৈরি করেন ?



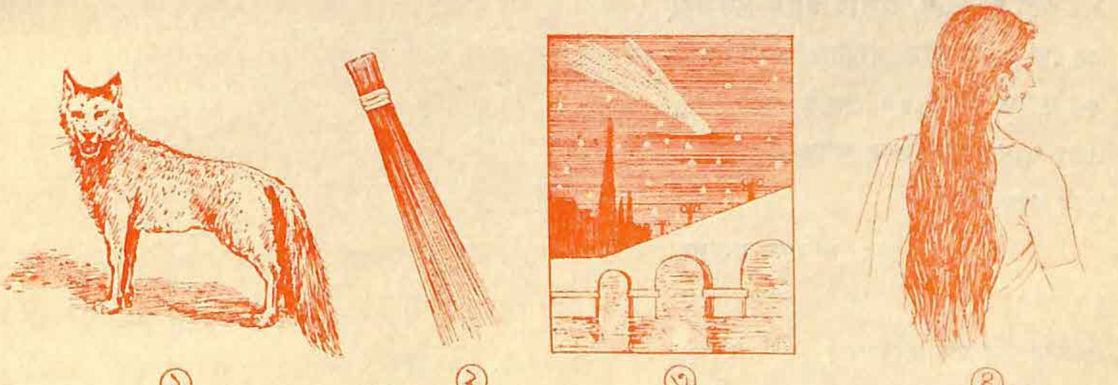
(৮)

৮। পঙ্গপাল শস্য খেয়ে জীবনধারণ করে, তবে আমরা তাদের মারতে চাই কেন? ৯। পঙ্গপাল যখন ঝাঁকে ঝাঁকে আকাশে ওড়ে, তখন সূর্য ঢাকা পড়ে, কিন্তু তখন সূর্যগ্রহণ বলি না কেন? ১০। সূর্যগ্রহণ হয় কেন? নীচের ছবি দেখে বল:



(৯)

নীচের ছবিগুলোর একটি বিষয়ে আকৃতির মিল আছে; সেই বিষয়টি নির্দেশ করে প্রশ্নের উত্তর লেখ:



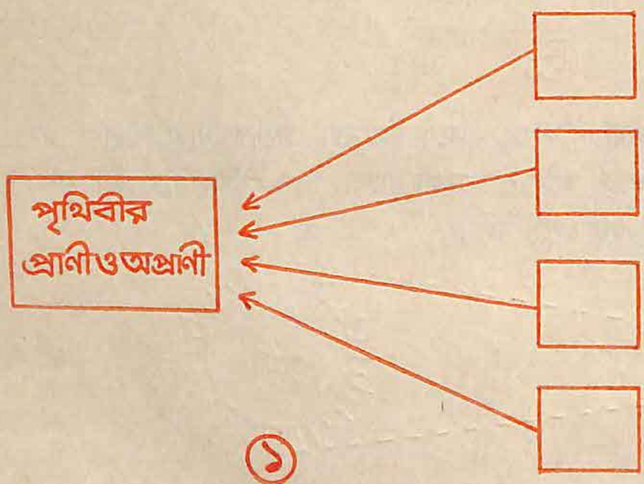
(১) (২) (৩) (৪)

১১। তিনটি ছবির কোন্ দিক দিয়ে মিল? ১২। ৩ নম্বর ছবিকে ভূগোলে কি বলে? ১৩। ধুমকেতুকে 'দীর্ঘকেশী' ('কমেট' ইংরেজি শব্দ এসেছে গ্রীক শব্দ কমেটেস থেকে, যার অর্থ দীর্ঘ-কেশী) বলা হয় কেন?

॥ ৪ ॥

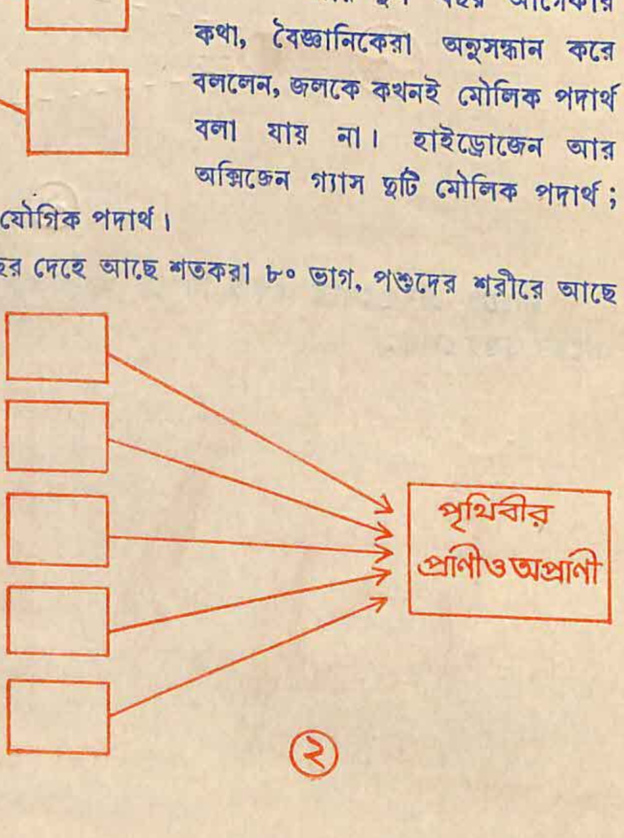
নীচের লেখাটি ভাল করে পড়ে প্রশ্নের উত্তর কর ঃ

॥ পৃথিবীতে গাছ, ফুল, ফল, পশু, পাখী, মানুষ প্রভৃতি অনেক রকমের প্রাণী ও অ-প্রাণী আছে। গ্রীক (গ্রীস দেশে যারা বাস করে) পণ্ডিতেরা মনে করতেন, এ সবই তৈরি হয়েছে চারটি মূল পদার্থ থেকে। সেই মূল পদার্থগুলোর নাম—বাতাস, আগুন, মাটি এবং জল। ভারতের লোকে পাঁচটি মূল পদার্থ ধরেছিলেন। এই পাঁচটিকে বলা হত পঞ্চভূত। পঞ্চভূত হচ্ছে,—ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম।



প্রায় দুশ' বছর আগেকার কথা, বৈজ্ঞানিকেরা অনুসন্ধান করে বললেন, জলকে কখনই মৌলিক পদার্থ বলা যায় না। হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন গ্যাস দুটি মৌলিক পদার্থ; তাদেরই মিলনে জল তৈরি হয়। অতএব জল যৌগিক পদার্থ।

ভূপৃষ্ঠের তিন চতুর্থ ভাগ জল। মাছের দেহে আছে শতকরা ৮০ ভাগ, পশুদের শরীরে আছে শতকরা ৬০ ভাগ, মানুষের শরীরে শতকরা ৭০ ভাগ, জলীয় গাছে শতকরা ৯৫ থেকে ৯৯ ভাগ, মাটিতে যে-সব গাছ হয় তাতে আছে ৫০ থেকে ৭৫ ভাগ, এবং পাথর প্রভৃতিতে শতকরা প্রায় ১৪ ভাগ জল আছে ॥



১। ১নং ছবিতে কাদের মত বলা হয়েছে? ২। ২নং ছবিতে কাদের মত বলা হয়েছে? ৩। ফাঁকা ঘর গুলোতে পুরনো যুগের মত অনুযায়ী

মৌলিক পদার্থের নাম লেখ ৪। ভারতের লোক কোন্ পদার্থটিকে বেশি ধরেছেন ? ৫। যৌগিক পদার্থ কাকে বলে ? ৬। জলের মধ্যে কোন্ কোন্ মৌলিক পদার্থ আছে ? ৭। ১৯৭৬ সালকে যদি 'আজ' বলা যায় তবে দু'শ' বছর আগেকার সাল কত ? ৮। পৃথিবীর উপরিভাগে যে-পরিমাণ জল আছে, আনুমানিক সেই পরিমাণ জল কার কার শরীরে আছে ?

* * *

॥ গ্রীষ্মকাল। বেশ রাত্রি হয়ে গেছে। বাইরের ঘরে হেনা বই নিয়ে পড়ছে। এমন সময় রুণু দৌড়তে দৌড়তে এল। হেনাকে বললে, জানিস্ দিদি ! সর্বনাশ হয়ে গেছে।

—কি হয়েছে রে ?

—অনাবৃষ্টি হবে। এবার আর কোন ফসল জন্মাবেনা !

—কেন ? কি করে বুঝলি ?

—আকাশের তারার আলো সবুজ দেখাচ্ছে !

হৈ-চৈ শুনে মা বাইরে এলেন। তিনি হাসতে হাসতে বললেন, তারাগুলো তো নীল আলো দিচ্ছে। খুব বৃষ্টি হবে। রুণু রঙ চেনে না, রঙ-কানা ॥

* * *

উপরের লেখায় কে কোন্ কথা বলেছিল সব ক্ষেত্রে লেখা হয় নি ; শুধু ড্যাশ চিহ্ন দেওয়া আছে। ড্যাশ চিহ্নের আগে যার কথা তার নাম লেখ ; নীচের প্রশ্নের উত্তর দাও :

১। অনাবৃষ্টির সময় 'তারা' কি রঙের আলো দেয় ?
২। বৃষ্টির আগে 'তারা' কি আলো দেয় ?
৩। রঙ-কানা বলতে মা কি বলতে চেয়েছেন ? 'রাত-কানা' শব্দের কি অর্থ হতে পারে ?
৪। রুণু আর হেনার মধ্যে কে বয়সে বড় ?
৫। আমাদের দেশে কোন্ কোন্ মাসকে গ্রীষ্মকাল বলে ?

॥ ৫ ॥

প্রথমভাগে তোমরা বিশেষ্য পদ পড়েছ। কিন্তু বিশেষ্য পদ বুঝতে পারলেই সব কিছু বোঝা যায় না। ক্রিকেট আর ফুটবল দু-ধরণের খেলার নাম। ঐ খেলার বিষয় না জানলে বিশেষ্য পদ জেনে খেলার কথা বোঝা যায় না।

নীচের ছবি দুটি লক্ষ্য করে নির্দেশমতো উত্তর কর :





যে-খেলায় যে নিয়ম আছে নীচের প্রশ্নে সেই নিয়মের পাশে খেলার নাম লেখ, যে নিয়ম এই দুটি খেলার কোনটিতেই নেই তার পাশে × চিহ্ন দাও :

১। দুইটি দল থাকে।

২। প্রত্যেক দলে ১১ জন করে খেলোয়াড়।

৩। শুধু বল দিয়ে খেলতে হয়।

৪। ১১ জনই হাত দিয়ে বল ধরতে পারে।

৫। পা দিয়ে বল খেলতে হয়।

৬। দুইজন মাত্র হাত দিয়ে বল ধরতে পারে।

৭। সবাই হাত দিয়ে বল ধরতে পারে।

৮। কয়দিনে খেলা হবে ঠিক করে নেওয়া হয়।

৯। কয়মিনিটে খেলা হবে ঠিক করে নেওয়া হয়।

১০। খেলায় হার-জিত অল্প সময়ে ঠিক হয়ে যায়।

১১। দুইদলে মিলে মাঠে একবারে মাত্র ১৩ জন খেলে।



স্বাতীর বন্ধু স্বপ্না। স্বাতী বন্ধুর বাড়ীতে গিয়েছিল। ফিরে এসে বলল—

'বেলা ঠিক আটটার সময় স্বপ্নাদের বাড়ীতে গেলাম। ঘরে আলো ছিল, আমরা খেলতে বসলাম। ক্যারম খেলা। আমাদের খেলা তখন এগিয়ে এসেছে; হঠাৎ আলোটা নিভে গেল। কি বিপদ দেখ দিকি!'

উপরের বিবরণটি পড়ে নীচের প্রশ্নের উত্তর লেখ ঃ

১। স্বাতী কাদের বাড়ীতে বেড়াতে গিয়েছিল? ২। স্বপ্নার সঙ্গে স্বাতীর সম্পর্ক কি? ৩। বেলা তখন কয়টা? ৪। ঘড়ি দেখে কি বোঝা যাচ্ছে? ৫। ঘড়িতে সকাল কি সন্ধ্যা বোঝা যায় না কেন? ৬। তখন কিসের আলো থাকবে? ৭। স্বাতীর কথায় কোন্ আলোর কথা বোঝা যাচ্ছে? ৮। দিনের বেলায় স্বপ্নাদের বাড়ীতে আলো জ্বালাতে হয় কেন? ৯। ঘিঞ্জি এলাকায় বাড়ী হলে দিনের বেলাতে ঘর অন্ধকার থাকে কেন?

সব কথা বুঝে না নিলে শুধু বিশেষ্যপদে কোন বিবরণ বোঝা যায় না। বাড়ী সম্পর্কে, আলো সম্পর্কে স্বাতীর যে ধারণা ছিল, আমাদের তা ছিল না। কোন্ বেলা কি সময়ে স্বাতী বলে না দিলে আমরা ঘড়ি দেখে বেলা ঠিক করতে পারতাম না।

বাক্যে বিশেষ্যপদ ব্যবহার করবার সময় সেই বস্তুর আকৃতি-প্রকৃতি, কাজের সম্পর্ক ছবির মতো মনে রাখতে হয়।

স্বপ্নাদের বাড়ী যে ঘিঞ্জি এলাকায় তা কিন্তু স্বাতী বলেনি, তবু আমরা বুঝেছি। কারণ, প্রাকৃতিক নিয়ম যে, দিনের বেলাতে সূর্যের আলোই থাকে, কৃত্রিম আলো জ্বালাতে হয় না। বড় বড়

বাড়ীর জন্য তাদের বাড়ীতে সূর্যের আলো ঢুকতে পায় না ; অতএব এই অঞ্চলটি ঘিঞ্জি, এক বাড়ী থেকে অন্য বাড়ীর মাঝখানে এতটুকু জায়গা নেই। স্বপ্নারা সূর্যের মুখ দেখতে পায় না। এক কথায় বলা যায়—অসূর্যম্পশ্যা (শব্দটি সংস্কৃত থেকে বাংলায় এসেছে)।

শুভঙ্কর ছোট্ট ছেলে। সে বলছিল,

—ঠিক সেই সময় বাঘ দেখতে পেলাম।

শুনে ভয় হতে পারে। ছোট্ট ছেলে সে বাঘ দেখল কি করে! শুভঙ্করকে জিজ্ঞাসা কর, সে বলবে—চিড়িয়াখানার খাঁচায়।

বনে বাঘ দেখা বিপজ্জনক। মানুষে বলতেই বলে,—সাপের লেখা, বাঘের দেখা। চিড়িয়াখানার খাঁচায় বাঘ সাবধানে রাখা হয়।

বাঘ একটি পশুর নাম। বাক্যে ব্যবহার করা হয়েছে তাই এটি বিশেষ্যপদ। কিন্তু এই বিশেষ্যপদ দেখে বাক্যের অর্থ বোঝা যায়নি। বাঘটি কি অবস্থায় ছিল, জানা দরকার। শুভঙ্করের সম্পর্কেও জানা দরকার। যাঁরা শুভঙ্করকে জানেন, তাঁরা বুঝতে পারেন সে কোথায় বাঘ দেখতে পেয়েছে।

এই সব জানলেই ঠিক খবরটি জানা যায়। ঠিক খবর জানলেই আমাদের মনের ভাব ঠিক মতো হবে। খবরের সঙ্গে মনের ভাব এক হলে সেই বিষয়ে সমস্ত পরিচয় আপনি ঘটবে। এই পরিচয় ঘটলেই বাক্যের অর্থ বোঝা যায়।

॥ ৬ ॥

নীচের বাক্যগুলি থেকে বিশেষ্যপদ বের কর :

১। চাষী ধান বুনছে। ২। মাঠ ফসলে ভরে গেছে। ৩। প্রবীর মাঠে খেলছে। ৪। মা মাছ কুটছেন। ৫। আছিয়া ডাল রাঁধছে। ৬। বাবা খোকনের জন্য ঘোড়া কিনে এনেছেন। ৭। খোকন দোল্‌নায় চড়েছে। ৮। পাখীটা ডাল থেকে উড়ে গেল ৯। ঘুড়িটা উড়ছে। ১০। ঢাক বাজছে। ১১। ঘড়ি বাজছে। ১২। কাকীমা পুকুরে গেছেন। ১৩। হাঁসগুলো পুকুরে গেছে। ১৪। দোকান থেকে জিরে কিনে আন। ১৫। দাদা দোকান থেকে পাউডার কিনে এনেছেন। ১৬। পাগলীর মা ঢেঁকিতে ধান ভান্‌ছে। ১৭। বিলাসী মুড়ি ভাজছে। ১৮। বৈষ্ণবী গান গাইছে। ১৯। ওস্তাদ গান গাইবে। ২০। হরিদাসী ঢেঁকিতে চিড়ে কুটছে।

২ নম্বর আর ৩ নম্বরে 'মাঠ' শব্দ আছে। স্থানের নাম। কিন্তু দুটিতে দু-রকমের কাজ হয়। একটিতে খেলা হয়, অন্যটিতে ফসল বোনা। 'মাঠ' দুটির প্রকৃতি পৃথক। কাজ অনুসারে প্রকৃতির পার্থক্য হয়।

উপরের ২০টি বাক্য থেকে খুঁজে বের কর, একই নাম কোন্ কোন্ নম্বরে আছে। কি কি প্রকৃতির তা নীচের মতো ছক কেটে লেখ। (২টির উত্তর দেওয়া হল)

নাম	বাক্যের নাম	কোন্‌টি কি ধরণের
মাঠ	২	যেখানে ফসল বোনা হয়
মাঠ	৩	যেখানে খেলা করা হয়
ডাল		
ডাল		
দোকান		
দোকান		
দোকান		
গান		
গান		

ঐ বাক্যগুলি আবার পড়ে নিয়ে নীচের প্রশ্নের উত্তর লেখ:

১। কাকীমা পুকুরে গেছেন— কাকীমা পুকুরে কেন গেছেন বলে মনে হয়?
হাঁসগুলো পুকুরে গেছে— হাঁসগুলো পুকুরে কেন গেছে?

২। ঢাক বাজছে— ঢাক কিভাবে বাজানো হয়?
ঘড়ি বাজছে— ঘড়ি কেমন করে বাজে?

৩। (ক) চাষী ধান কোথায় বুনছে? ধান বুনছে কেন?
(খ) পাগলীর মা ধান কি দিয়ে ভানছে? কেন ভানছে?

৪। ৬ নম্বর বাক্যের 'ঘোড়া' যে পুতুল—কেমন করে বোঝা যাবে?

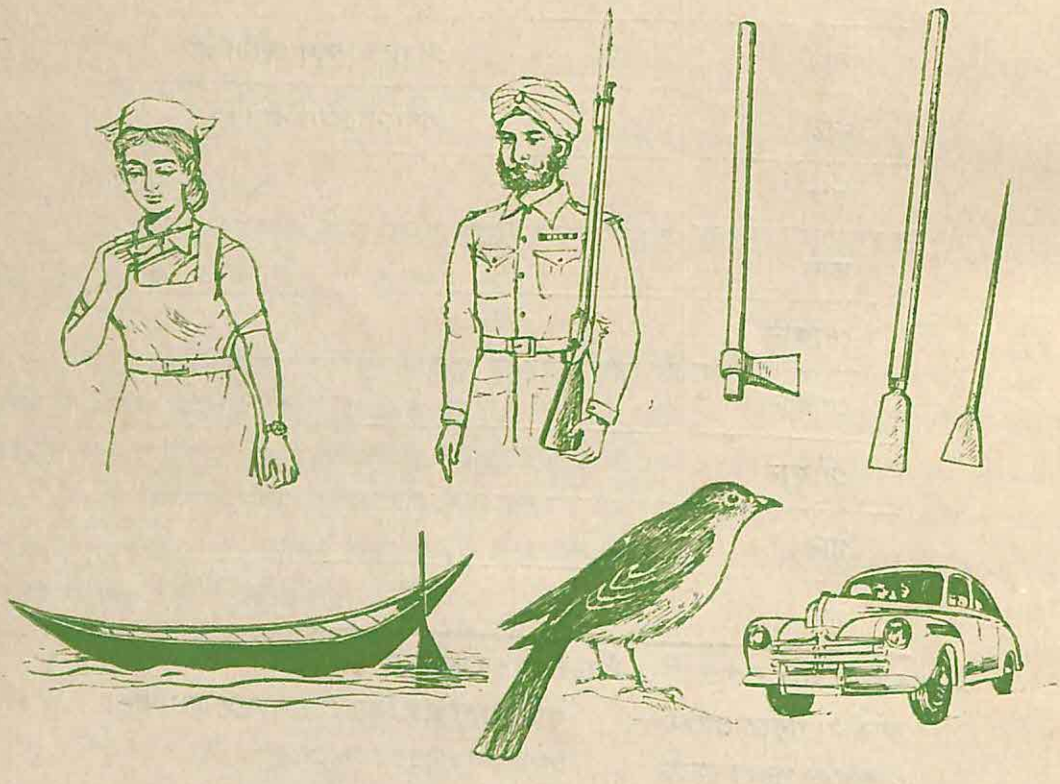
৫। দোল্‌না কি রকমের জিনিস? খোকন দোল্‌নায় চড়েছে কেন?

৬। (ক) মাছ কি ভাবে কোটা হয়? (খ) চিড়ে কিভাবে কোটা হয়?

৭। (ক) পাখীটা নিজেই উড়তে পারে কেন? (খ) ঘুড়ি নিজে উড়তে পারে না কেন?
(গ) পাখীর কোন্ নিয়ম অনুসারে ঘুড়ি ওড়ানো হয়?

৮। (ক) মুড়ি ভাজতে প্রধানত কোন্ জিনিসের দরকার হয়? (খ) চিড়ে কুটতে প্রধানত কোন্ জিনিস দরকার হয়? (গ) চাল ভাজছে—তবে মুড়ি ভাজছে বলা হয় কেন? (ঘ) ধান ভানছে, তবে 'চিড়ে কুটছে' বলা হল কেন?

॥ ৭ ॥



উপরের ছবিগুলি দেখে নীচের প্রশ্নের উত্তর লেখ ঃ

১। কোন্ কোন্ মানুষ বিশেষ ধরণের পোষাক পরেছে। হাতের জিনিস দেখে বল, ঐরকম পোষাক পরবার কারণ কি ?

২। খোন্তা দিয়ে কি করা হয় ? কুড়ুলের সঙ্গে খোন্তার পার্থক্য কি ? খুন্তী কি কাজে লাগে ? খোন্তা আর খুন্তীর মধ্যে কোন্‌টা বড় ?

৩। নৌকা কোথায় চালাতে হয় ? নৌকার হাল কোথায় থাকে ?

৪। নৌকার হাল আর পাখীর লেজ—এই দুইটির কাজের মধ্যে কিরূপ মিল দেখতে পাওয়া যায়, কয়েকটি বাক্যে লেখ।

৫। মোটরকার 'ভেসে চলেছে' বলি না কেন ?

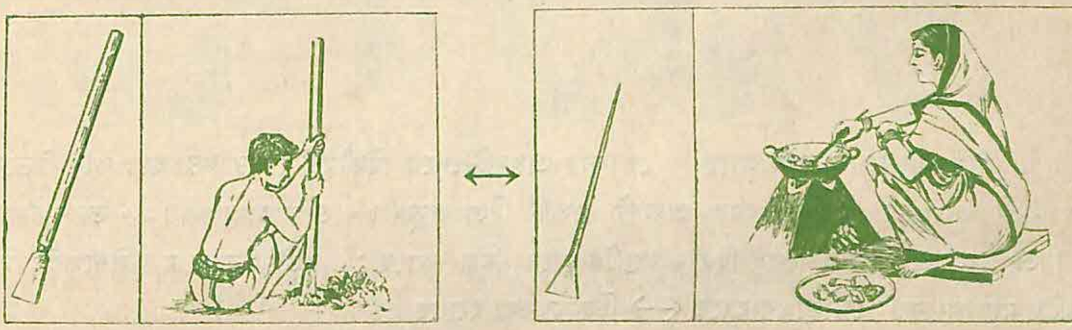
৬। আকাশের পশ্চিমে জল নেই, তবু সূর্য অস্ত গেলে 'সূর্য ডুবে গেল' বলি কেন ?

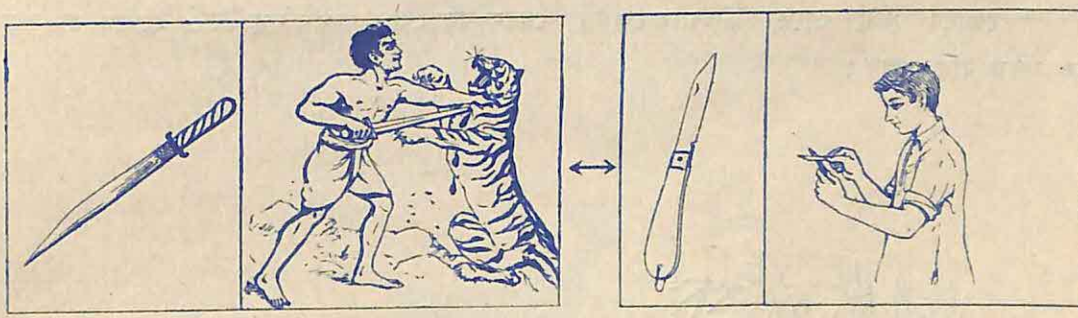
॥ ৮ ॥

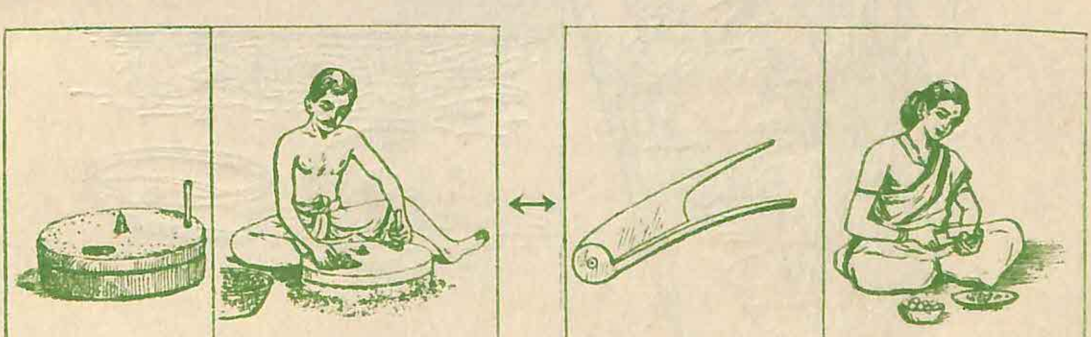
গাছের ছোট-বড় আকার থাকে। কিন্তু একদিনেই তো গাছ বড় হয় না। তাই বয়স অনুসারে গাছের নাম হয়—চারা গাছ, বড় গাছ। বয়স অনুযায়ী মানুষেরও নাম আছে—শিশু, কিশোর, যুবক, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ।

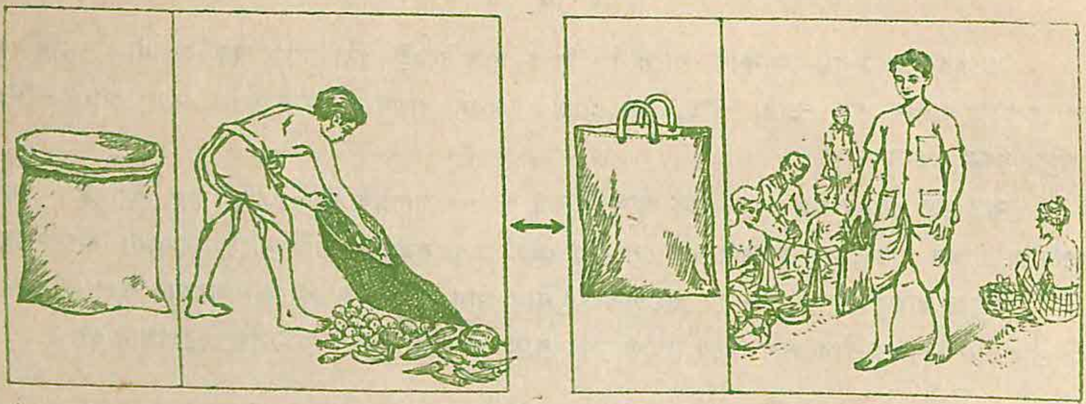
কতগুলি কৃত্রিম বস্তু আছে, যে-গুলো একই ধরণের কাজের জন্য তৈরি করা হয়েছে। বেশি পরিশ্রম আর অল্প পরিশ্রমের কাজের জন্য সেগুলো ছোট এবং বড় হয়, তাই নামে অনেকটা মিল আছে।

নীচের ছবির সম্পর্ক দেখ। প্রত্যেকটির নাম লেখ ; কি কি কাজে ব্যবহার করা হয় লেখ ; ছবির ভাব অনুযায়ী প্রত্যেক শব্দ দিয়ে পৃথক পৃথক বাক্য লেখ ; সম্পর্ক ⟷ চিহ্নে বোঝান হল।



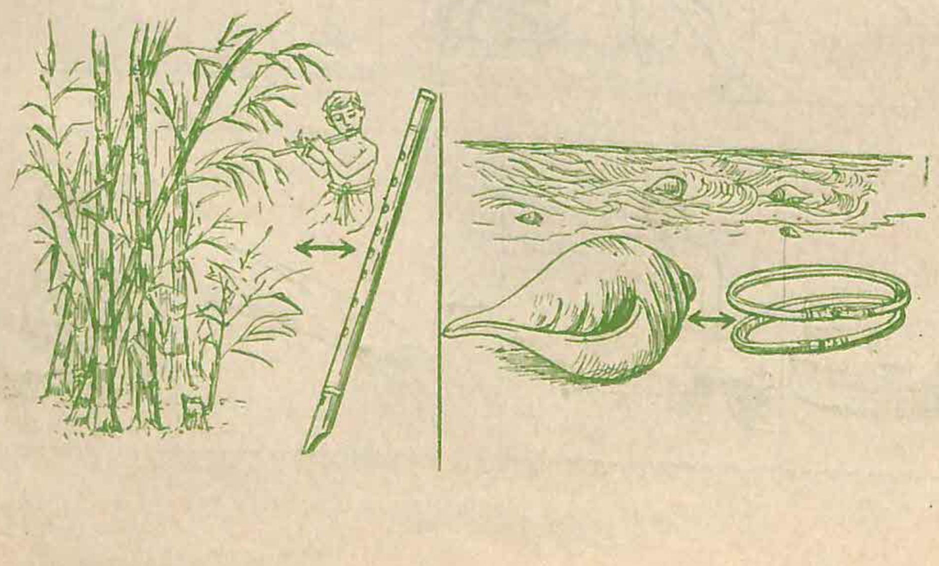


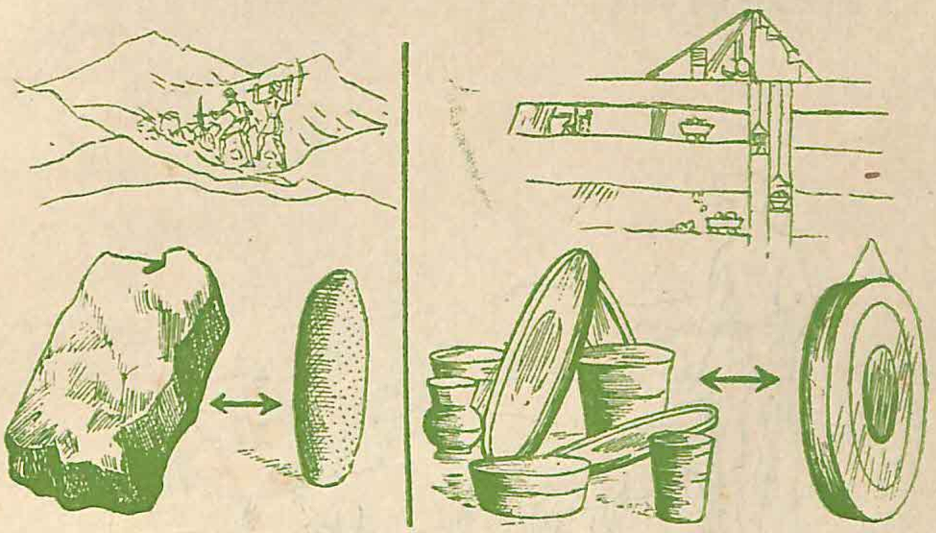




নীচে চার-জোড়া ছবি আছে। জোড়ার প্রথমটি থেকে দ্বিতীয়টি তৈরি করা হয়, তাই উভয়ের নামে মিল আছে। শেষ জোড়ার প্রথমটি একটি মিশ্র ধাতু (৮০ ভাগ তামা আর ২০ ভাগ টিন) ; এই মিশ্র ধাতু থেকে তৈরি বলেই দ্বিতীয় বস্তুটির নামে মিল আছে ; দ্বিতীয়টির নাম লিখলেই মিশ্র ধাতুটির নাম পাবে। জোড়া বোঝাতে ⟷ চিহ্ন দেওয়া হয়েছে।

জোড়া মিলিয়ে প্রত্যেকটির নাম লেখ। কোন্ বস্তু থেকে অপর বস্তু তৈরি হয়েছে তা বুঝিয়ে পৃথক পৃথক বাক্য লেখ ঃ





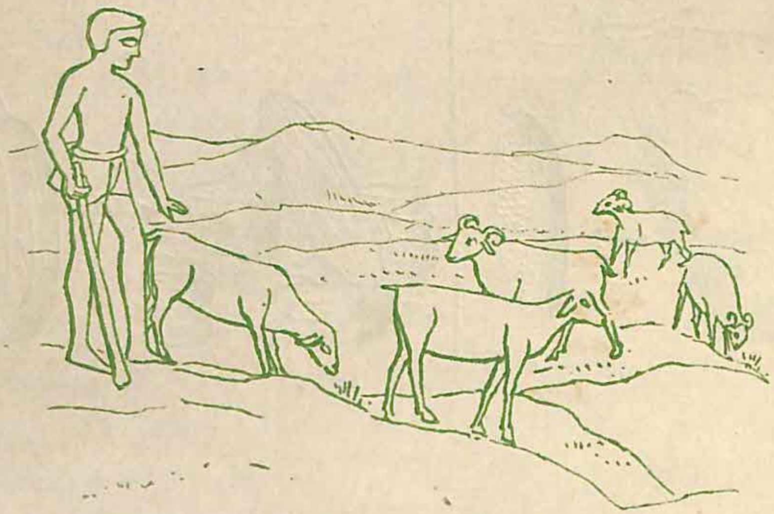
॥ ৯ ॥

আজকে থেকে প্রায় হাজার হাজার বছর আগে মানুষ যেমন করে আহার যোগাড় করত তা পরের ছবিগুলোতে বোঝানো হল। এই মানুষ স্থায়ীভাবে বাস করতে পারত না। দলবেঁধে তারা

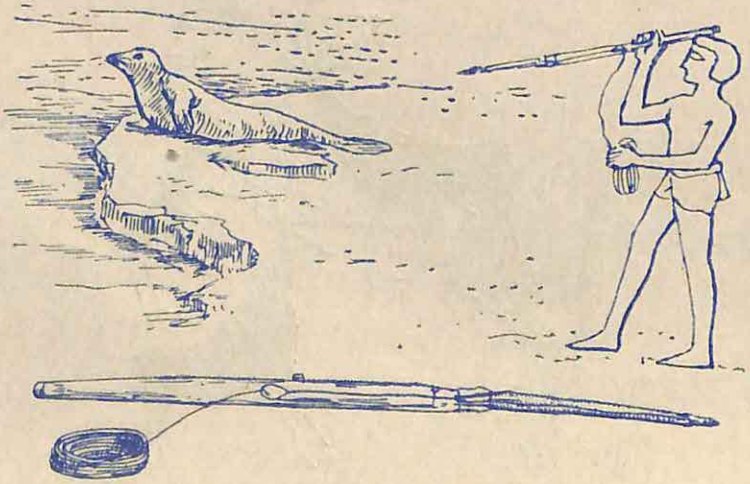


আদিম মানুষ পশু শিকার করছে।

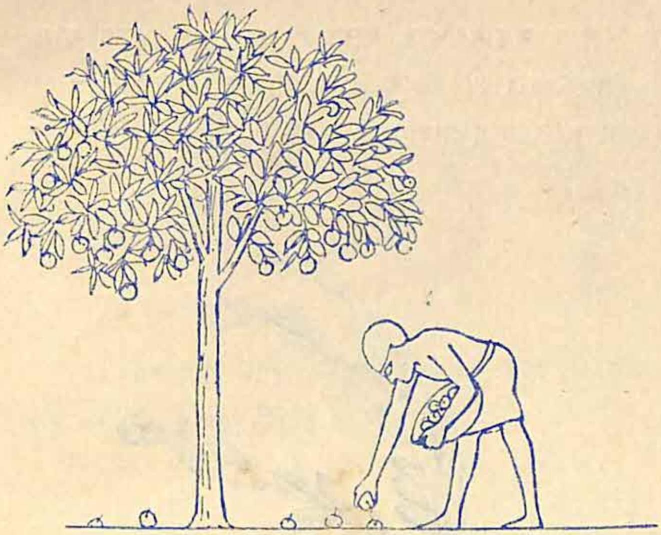
আহার সংগ্রহ করতে ঘুরে বেড়াত, একস্থান থেকে অন্যস্থানে। এরা যাযাবর। পশু শিকার করত, পশু চরাত, মাছ মারত আর ফল কুড়াত।



পশু চরাচ্ছে আদিম মানুষ



হার্পুন দিয়ে মাছ মারছে

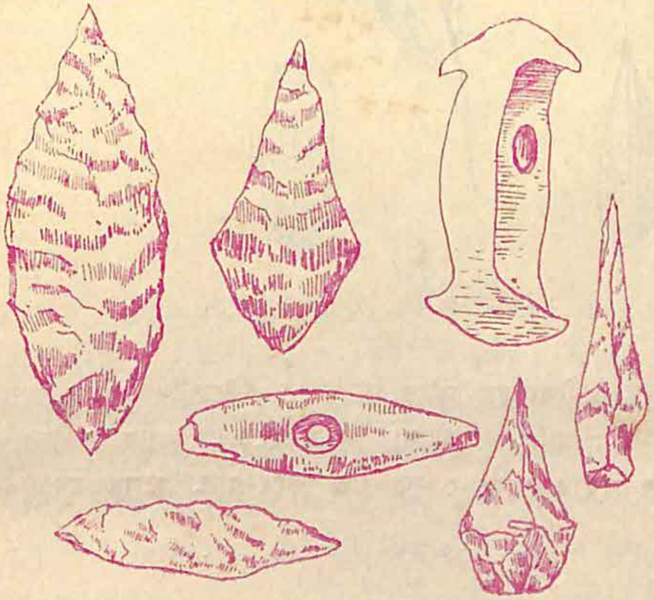


অস্ত্র কোথায় পাবে, ধাতুর অস্ত্র তো ছিল না। প্রকৃতির কোলে অনেক পাথর আছে, পশুর হাড় আছে।

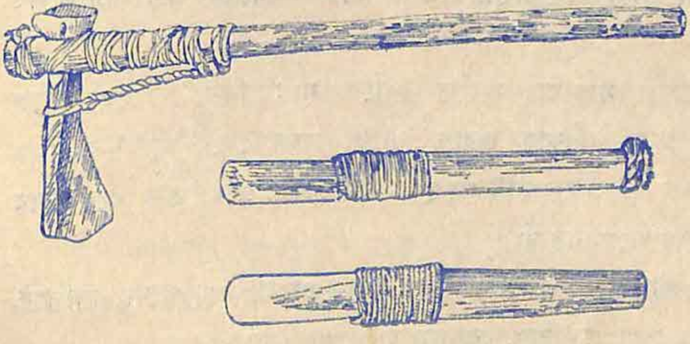
পাথর ভেঙে ঘষে কুড়োলের মতো করবে, কোদালের মতো করবে; হাড়ের কোদাল, বাটালি কিংবা তীর তৈরি করবে। এসব তৈরি করা আবার শিখতে হত। যারা ভালো অস্ত্র তৈরি করতে পারত তারা ঐ কাজ করেই খাদ্য সংগ্রহ করত। মেয়েরাও এইসব অস্ত্র তৈরি করত।

* *

উপরের ছবিতে দেখা যাচ্ছে, একটি মানুষ ফল কুড়োচ্ছে। তারা দলবদ্ধ হয়েই এ সব কাজ করত। ফল কুড়াত, ফল পাড়ত।

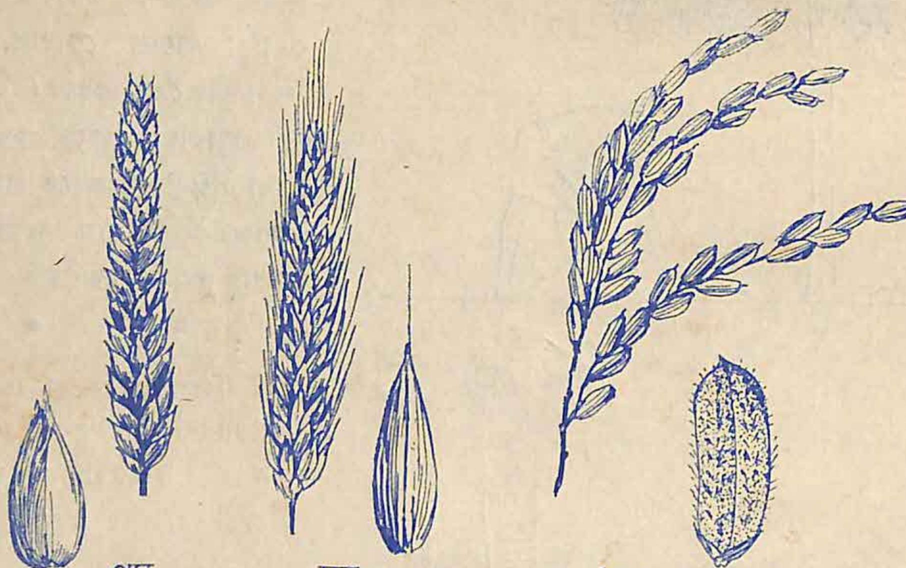


পাশের ছবিতে প্রথমে দেখা যাচ্ছে পাথরের অস্ত্র। আস্ত পাথর ভেঙে, ঘষে, চেঁছে কতরকমের অস্ত্র তৈরি করত।



কোন কোন গোষ্ঠী আবার হাড় দিয়েও নানা রকম অস্ত্র তৈরি করত; কোদাল, বাটালি, আরও কত কি!

পশুচারণ করতে করতে এক সময় শস্যের সন্ধান পায় মানুষ। দুজাতের বুনো ঘাস— ডিঙ্কেল আর এমার ; তাদের থেকে এল গম। একটু পাহাড়ী অঞ্চলে এইগুলো হত। যব-ও পাহাড়ী অঞ্চলের। যেখানে জল আছে, সমতল ভূমি এবং আর্দ্র বায়ু সেখানে ধান হল।

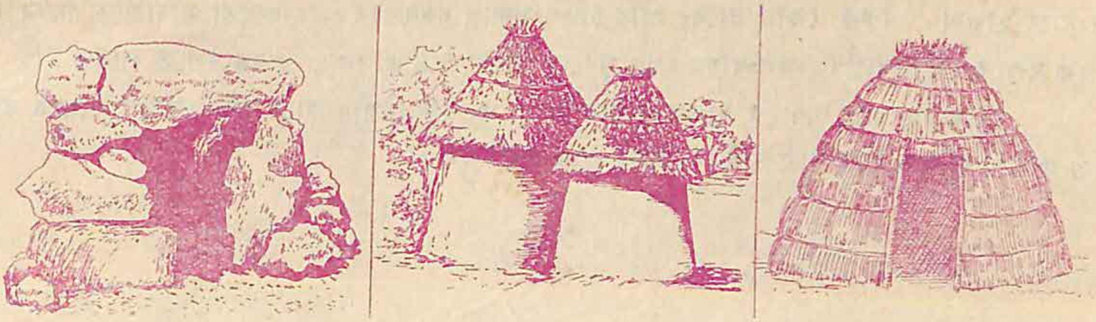


চাষ সুরু হল তো বাস-ও সুরু হল। নীলনদের তীরে, টাইগ্রিস ইউফ্রেটিস নদীর ধারে, সিন্ধু নদের তীরে, গঙ্গার তীরে, ইয়াংসিকিয়াঙে ; অর্থাৎ এশিয়া আর আফ্রিকাতে। মানুষ স্থায়ীভাবে গ্রাম পত্তন করে বাস করতে লাগল। কারণ শিকার করতে করতে পশু কমে যায়, ফলের সময় না হলে ফল পাওয়া যায় না।

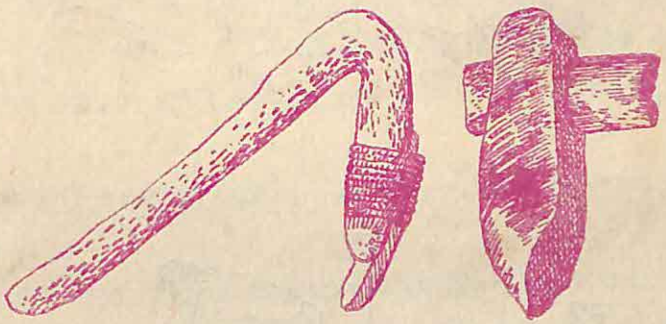
কিন্তু চাষ করলেই শস্য পাওয়া যায়, শস্যভাণ্ডার তৈরি করে অসময়ের জন্য শস্য তুলেও রাখা যায়।

পশু শিকারে ছোট ছেলেমেয়েরা সাহায্য করতে পারে না ; কিন্তু চাষের কাজে তারাও সাহায্য করতে পারে। তারা আগাছা পরিষ্কার করতে পারে, ক্ষেত থেকে পাখী তাড়াতে পারে। এরা কৃষিজীবী, চাষী ; স্থায়ী ঘর-বাড়ী আছে তাই গৃহস্থ। বন কেটে, জমি তৈরি করে তবে তো এই চাষ-বাস। তাই কেউ বসতবাটী ছাড়তে চায় না।

ঘর কি দিয়ে তৈরি করত ? একটা বড় পাথরের উপর আর-একটা বড় পাথর চাপিয়ে, কোথাও গাছপালার পাতা দিয়ে, কোথাও নল-খাগড়া দিয়ে, যেখানে যা পাওয়া যেত।

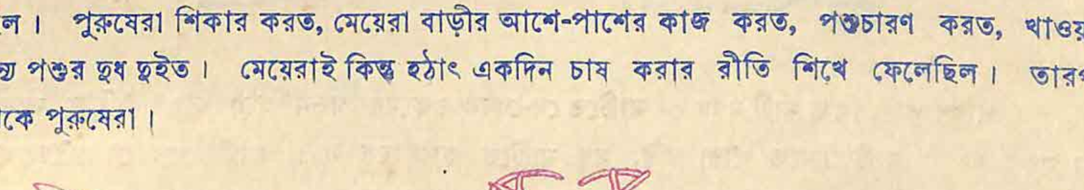


এখনকার মতো বড় বড় মাঠে চাষ করা হতো না, বাড়ীর কাছে বাগান করার মতো চাষ। আর এই চাষের অস্ত্র নীচের ছবিতে দেখ।



জমির উর্বরতা শক্তি চিরকাল থাকে না। যখন জমি অনুর্বর হয়ে যেত তখন তারাও অন্যত্র চলে যেত। সেখানে আবার নতুন গ্রাম বসত। তখন সেখানে আবার বন পরিষ্কার করতে হবে, জলা জায়গা শুকনো করতে হবে, শুকনো জায়গায় জল আনতে হবে। কাজেই দল থাকা চাই।

কেবল চাষেরই উপর তারা তখনও নির্ভর করত না। পশু শিকার, পশু-চারণ, পশু পালনও ছিল। পুরুষেরা শিকার করত, মেয়েরা বাড়ীর আশে-পাশের কাজ করত, পশুচারণ করত, খাওয়ার জন্য পশুর দুধ দুইত। মেয়েরাই কিন্তু হঠাৎ একদিন চাষ করার রীতি শিখে ফেলেছিল। তারপর থেকে পুরুষেরা।



মানুষের এক গোষ্ঠীর সঙ্গে অন্য গোষ্ঠীর মিশ্রণও ঘটছে। নতুন জায়গায় গেলে সেখানকার জল-বায়ুর খবরও তো জানতে হবে। আব-হাওয়া আর জল-বায়ু পৃথক, শব্দের অর্থ যদিও এক (আব = জল ; হাওয়া = বায়ু)। কয়েকদিন ধরে মেঘলা হচ্ছে, বৃষ্টি হচ্ছে, কি গরম পড়ছে, একে বলা

হয় আব-হাওয়া। কিন্তু কোন স্থানের প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর ধরে আব-হাওয়া সাধারণত যেমন হয় তাকে বলা হয় জল-বায়ু। জল-বায়ুর খবর পুরনো অধিবাসী ছাড়া কেউ তখনও বলতে পারত না।

পাথরের অস্ত্রে কাঠের হাতল লাগান হল। ছুতোর মিস্ত্রীর কাছে তখন লোককে যেতে হল। শস্য জমিয়ে রাখতে হলে পাত্র চাই। মাটির পাত্র তৈরি হল।



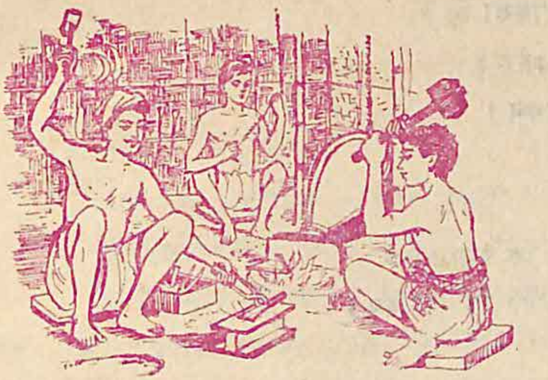
ছুতোরের কাজ



কুমোরের কাজ

পাথর শক্ত, কিন্তু মাটি নরম। মাটিতে যে-কোন রকমের গড়ন গড়া যায়। কিন্তু কাজটা তো সহজ নয়। মাটি চিনতে পারা চাই, সব মাটিতে কাজ হয় না। মাটি শুকোলে গুঁড়ো হয়ে যাবে, অথচ তাপ দিয়ে শুকোতে হবে। তাপের যে মাত্রায় জল গরম হয়, তার ছ-সাত গুণ তাপের দরকার হয়। কিছু ঝিনুকের গুঁড়ো, কি পাথরের গুঁড়ো মিশাতে হয় শক্ত করবার জন্য। আগুনে মাটির রঙ খারাপ হতে পারে। এমনি কত ভাবনা চিন্তা আছে। এ কাজগুলোও প্রথমে বাড়ীর মেয়েরা করত, তারা আবার তাদের মেয়েদের শিখিয়ে দিত। এখন যে-সব লোক মাটির গড়নের এই কাজ করে তাদের বলে কুম্ভকার।

তারপর এল তামার কাজ, সোনা রূপোর কাজ, লোহার কাজ। কামার বা কর্মকারের কাজেরও অনেক দিক শিখতে হয়।





গ্রামের অনেককে মিলে মিশে এ কাজ করতে হত। তখনকার দিনের গ্রামের আয়তন খুব বড় ছিল না। সেকালকার (৭০০০ বছর আগে) একটি বর্ধিষ্ণু গ্রামের (থেসালীতে এই গ্রাম ছিল) আয়তন ছিল ১০০ × ৪৫ বর্গ মিটার, অর্থাৎ এক একরের বা ৪৮৪০ বর্গ গজের কিছু বেশি (কারণ একগজ = ০·৯১৪৪ মিটার)।

এইভাবে বেশ এক স্থায়ী সমাজ গড়ে উঠল। এর মধ্যে পণ্ডিত আছে, রাজা আছে, পুরোহিত আছে, কারিগর আছে, দাস আছে।

গ্রাম যখন বড় হয়ে গেল, লোকে বহুরকমের কাজে নিযুক্ত হল, শাসন ব্যবস্থা এসে গেল তখনই নগর গড়ে ওঠে। ভারতবর্ষে মহেঞ্জোদাড়োতে এমনি এক নগর ছিল। প্রাচীনতম নগরী উত্তর-পশ্চিম এশিয়ার জেরিকোতে ; সাইপ্রাসেও আর-একটি আছে।

সমাজ বলতে আমরা গ্রাম এবং নগরের অধিবাসীদের জীবন যাত্রা, কার্যপ্রণালী এবং শাসনব্যবস্থাকেই বুঝিয়ে থাকি।

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর কর ঃ

১। পশু চরানোকে কি বলা হয় ?

২। পশু শিকার করা হত কেন ? কিভাবে শিকার করা হয় ছবি দেখে বর্ণনা কর।

৩। পাথর আর হাড়ের অস্ত্রের মধ্যে পার্থক্য কি ?

৪। যারা একস্থান থেকে অন্যস্থানে জীবিকানির্বাহের জন্য ঘুরে বেড়ায় তাদের কি বলা হয়েছে ?

৫। কোন্ কোন্ বুনো ঘাস থেকে গমের উৎপত্তি হয়েছিল ?

৬। গৃহস্থ কাদের বলে ?

৭। এই লেখায় কি কি নদনদীর নাম পেয়েছ ?

৮। আবু-হাওয়া আর জল-বায়ুর মধ্যে পার্থক্য কি ?

৯। মেয়েরা সাধারণত কি ধরণের কাজ করত ?

১০। মাটির পাত্র তৈরি করা কঠিন ছিল কেন ?

১১। সমাজ কাকে বলে ?

১২। মহেঞ্জোদাড়ো কোথায় ছিল ?

১৩। মাটির পাত্র যারা তৈরি করে তাদের কি বলা হয় ?

১৪। লোহা বা ধাতুর কাজ যারা করে তাদের কি বলা হয় ?

১৫। অনুর্বর জমি কাকে বলা হয় ?

১৬। সূর্যকে পর্যন্ত দেখতে পায় না, এমন মেয়েদের কি বলা হয়েছে ?

পৃথক পৃথক ভাবে নীচের কথাগুলির অর্থ একাধিক বাক্য ব্যবহার করে বুঝিয়ে দাও ঃ

১। পাথরের অস্ত্র। ২। মাটির পাত্র। ৩। কলার পাতা।

৪। সোনার কাজ। ৫। বেতনের দিন। ৬। পাহাড়ের চূড়া।

৭। চিঠির পাহাড়। ৮। সমুদ্রের ডাক। ৯। হাসির তুফান।

১০। সাপের লেখা, বাঘের দেখা। ১১। বর্ধিষ্ণু প্রজা।

১২। গ্রামের আয়তন। ১৩। অচলায়তন। ১৪। সমাজ।

১৫। সমাজ-সেবা। ১৬। শাসন-ব্যবস্থা।

লিঙ্গার্থ নির্ণয়

॥ ১০ ॥

কোন কিছু সম্পর্কে জানতে হলেই তার আকৃতি আর প্রকৃতি বিচার করে নিতে হয়। পৃথিবীর সব কিছুকে মানুষ প্রাণী আর অপ্রাণী এই দুই জাতে ভাগ করে নিয়েছে।

প্রাণীর মধ্যে স্ত্রী আর পুরুষের আকৃতিগত পার্থক্য আছে। সিংহের কেশর আছে, সিংহীর কেশর নেই; ময়ূরের পেখম আছে, ময়ূরীর পেখম নেই; মেয়ে চড়ুই একরকমের, পুরুষ চড়ুই অন্য রকমের।

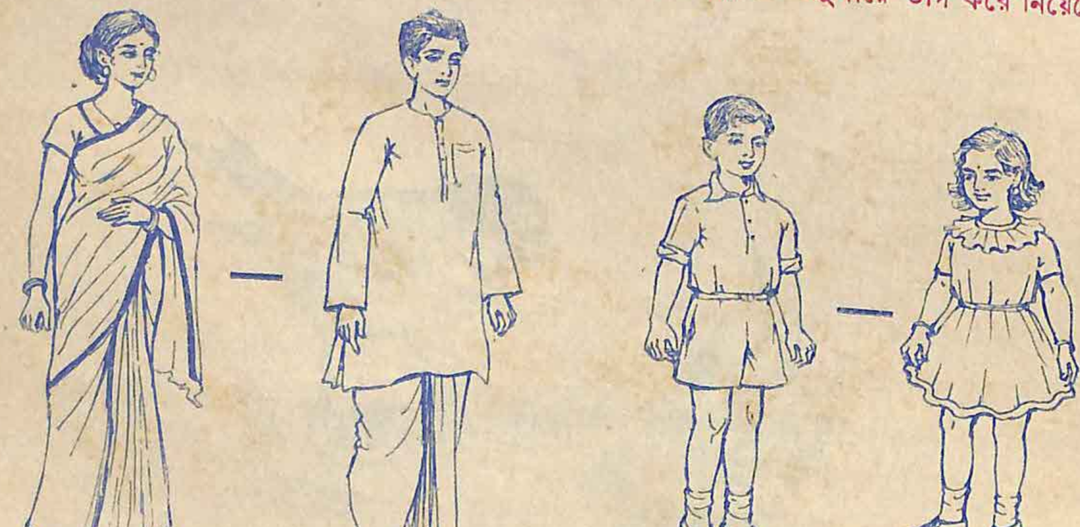






জীববিজ্ঞান পড়ে মাছ বা অন্যপ্রাণীর স্ত্রী-পুরুষের পার্থক্য জানতে পারি ; কারণ সব সময় বাইরে থেকে চেহারার এই প্রভেদ ধরা যায় না।

মানুষ নানাপ্রকারের কৃত্রিম কাজ করতে পারে। আকৃতি আর প্রকৃতিতে মানুষেরও স্ত্রী-পুরুষ পৃথক হয়। তারা সমাজের কাজ-কর্মও প্রকৃতি এবং আকৃতি অনুসারে ভাগ করে নিয়েছে।



মেয়ে এবং পুরুষ সুবিধার জন্য পোষাক-পরিচ্ছদেও পার্থক্য করে নিয়েছে।

চোখে দেখলে, ছবি আঁকলে এই পার্থক্য আমরা বুঝতে পারি। ভাষায় এই পার্থক্য বুঝাবার জন্য শব্দের কতগুলো পরিবর্তন করে নিতে হয়।

॥ ১১ ॥

এইসব শব্দ আমরা দুরকম ভাবে পেয়ে থাকি। প্রাচীন সাধুভাষায় (প্রথম ভাগ দেখ) ব্যবহার করা হয়েছে এমন শব্দ আমরা সাধুভাষার বই থেকে জানতে পারি, অভিধানেও পাওয়া যায়। আর চলতি কথায় আমরা কতগুলো ব্যবহার করি।

সাধু ভাষায়		চলতি ভাষায়	
পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী
ব্যাঘ্র	ব্যাঘ্রী	বাঘ	বাঘিনী
হংস	হংসিনী ; হংসী	হাঁস	হাঁসা (মাদী হাঁস)
নর	নারী	পুরুষ মানুষ	স্ত্রীলোক
মানব	মানবী		
মার্জার	মার্জারী	বিড়াল (হুলো বিড়াল)	বিড়ালী (মেনি বিড়াল)
ময়ূর	ময়ূরী	ময়ূর	ময়ূরী
পক্ষী	পক্ষিণী	পাখী	মাদী পাখী (পাখিনী নয়)
হস্তী	হস্তিনী	হাতী	মাদী হাতী
মৎস্য	মৎস্যী	মাছ	(মাছিনী বলি না)
সর্প	সর্পিণী	সাপ	সাপিনী
মৃগ	মৃগী	হরিণ	হরিণী
মোরগ	মুরগী	মোরগ	মুরগী

নর এবং নারী শব্দ দুটির যদি বর্ণবিশ্লেষণ করি তবে এই রকম হবে :

নর = ন্ + অ + র্ + অ। নারী = ন্ + আ + র্ + ঈ।

স্ত্রীলিঙ্গে পরিবর্তন করায় আমাদের শেষ ব্যঞ্জনবর্ণের আগে 'অ' স্থানে 'আ' হয়েছে এবং শেষ স্বরবর্ণ 'অ' স্থানে 'ঈ'-কার হয়েছে।

অন্যগুলির এইরকম বিশ্লেষণ করে দেখাও পুংলিঙ্গ শব্দ থেকে স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের কোন্ কোন্ বর্ণের বদল হয়েছে।

স্ত্রীবাচক শব্দের কোন্ কোন্‌টিতে ঈ-কার যুক্ত হয়েছে ?

... ... 'আনী' ... ?

'মেয়ে' শব্দ যোগ করে কোন্ কোন্ পুংলিঙ্গ শব্দের স্ত্রীবাচক শব্দ করা হয়েছে ?

'বিড়াল'এর কয় রকম স্ত্রীবাচক শব্দ আছে ?

॥ ১২ ॥

প্রাচীনকাল থেকেই আমাদের দেশের লোকে নিজদেরকে নানা শ্রেণীতে ভাগ করে নিয়েছে। এইসব 'শ্রেণী' মানুষের বিভিন্ন রকমের বৃত্তি বা কাজকর্ম থেকে এসেছে। সমাজে কত রকম কাজই না আছে !

প্রত্যেক সমাজের লোক মিলে মিশে নিজদের মধ্যে এইসব কাজ ভাগ করে নিয়েছিল। কেউ মাঠে চাষ করে, কেউ সেই ফসল বিক্রয় করে, সমাজের লোকে যাতে সুখে শান্তিতে থাকতে পারে তা দেখবার ভার কারও উপর দেওয়া হয়েছে, কেউ লোকের ঘর ছেয়ে দিচ্ছে, কেউ বন থেকে কাঠ কেটে আনছে, কেউ সেই কাঠ দিয়ে মানুষের ব্যবহারের সামগ্রী তৈরি করছে—এমনি সব নানারকম কাজকর্মেরই সমাজে দরকার পড়ে।

এইসব কাজকর্ম কিন্তু ছোটবেলা থেকেই শিখে নিতে হত। এই শিক্ষার ব্যাপার তাই ঘরোয়া হয়ে পড়ল ; বংশ বংশ ধরে এক ধরণের বৃত্তি একই শ্রেণীর-লোকে করতে থাকে। বৃত্তির নাম দিয়ে তাদের নামকরণ হল।

সমাজের পক্ষে সব কাজই যদি দরকার তবে 'ছোট কাজ' আর 'বড় কাজ'-এইসব কথা এল কেন ?

সত্যি কথা বলতে কি, কোন কাজই ছোট-বড় হয় না, কিন্তু অন্য সমাজের সংস্পর্শে এসে সমাজের লোকের কাজকর্ম বদলে যায়। তখন নতুন ধরণের কাজকর্মের দিকে মানুষের আগ্রহ বাড়ে, সেই কাজ করে ভালো পয়সা পাওয়া যায়, অবস্থা ভালো হয়। পুরনো কাজের লোকের অবস্থা খারাপ হয়ে যেতে থাকে ; তারা তাই সমাজে তেমন মর্যাদা পায় না।

যেমন ধরা যাক, এক সময় মাটির জিনিস মানুষ খুব ব্যবহার করত। ইতিহাসে পড়বে, মৌর্যযুগে কাঠের কাজের খুব চাহিদা ছিল। তখনকার সমাজে কুমোর, ছুতোর-মিস্ত্রীর খুব মর্যাদা ছিল। কিন্তু ধাতুর পাত্র এলে তাদের আদর কমে গেল, কামারদের আদর গেল বেড়ে। যাঁরা পুজো-পালি করতেন সেই পুরোহিতদের এক সময় খুব আদর ছিল ; কিন্তু সে-সব কমে যাওয়ায় পুরুতগিরি করা আর তেমন ভালো কাজ হিসেবে গণ্য হল না। এক সময় আমাদের দেশে সংস্কৃত ভাষা চর্চা করে বিদ্যা অর্জন করা এবং অর্থ উপার্জন করা সম্ভব হত। ইংরেজি ভাষা সমাজে এসে গেলে, 'পণ্ডিত'-দের আর সে সম্মান থাকল না।

বৃত্তি থেকে শ্রেণী ; সেই শ্রেণীর নামেরও পুংলিঙ্গ এবং স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ আছে :

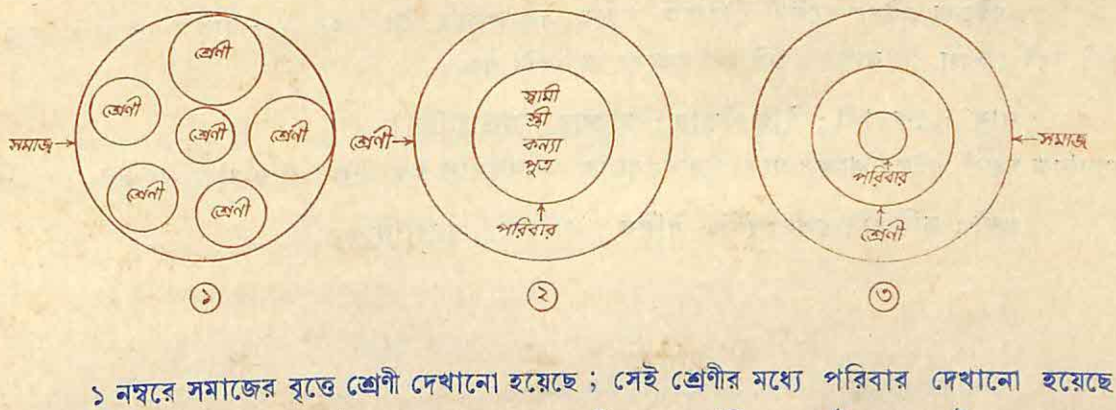
পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
ব্রাহ্মণ	ব্রাহ্মণী
রজক	রজকিনী (রজকী)
ধোপা	ধোপানী
নাপিত	নাপিতানী
গোয়ালা	গোয়ালিনী
ঠাকুর	ঠাকুরাণী
রাজা	রাণী
লেখক	লেখিকা

বাঁ দিকের শব্দগুলো পড়ে নীচের প্রশ্নের উত্তর লেখ :

১। ব্রাহ্মণ সাধারণত কি কি কাজ করে থাকেন ?
২। রজক আর ধোপার বৃত্তিতে তফাৎ কি, অভিধান দেখে বল।
৩। রাণীর সঙ্গে রাজার সম্পর্ক কি ?
৪। মহারাজ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে কি হবে ?
৫। শহরের লোক কোন্ কোন্ স্ত্রীবাচক শব্দ বর্তমানে ব্যবহার করে না ?

॥ ১৩ ॥

বৃত্তি বা উপজীবিকা নিয়ে আমাদের সমাজে যেমন শ্রেণী বা বর্ণ হয়েছে তেমনি সব শ্রেণীর মধ্যেই পৃথক পৃথক পরিবার আছে। একটি পরিবারের মধ্যে সাধারণত স্বামী, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা থাকেই। নীচের ছবিটি দেখ :



১ নম্বরে সমাজের বৃত্তে শ্রেণী দেখানো হয়েছে ; সেই শ্রেণীর মধ্যে পরিবার দেখানো হয়েছে ২ নম্বরে। ৩ নম্বরে আছে একটি সমাজের মধ্যে শ্রেণী এবং পরিবার দুটির কোন্‌টি কার মধ্যে। পরিবারের মধ্যে মেয়েরা যে-ধরণের কাজ করেন তাকে বলে 'ঘরের কাজ' ; পুরুষদের কাজ হচ্ছে 'বাইরের কাজ'। সাধারণত শ্রেণী বা বৃত্তির কাজই বাইরের কাজ অর্থাৎ সমাজের কাজ। মেয়েদের 'ঘরোয়া কাজ' সব পরিবারেই সমান।

যে-সব বৃত্তির কাজ পরিবারের মেয়েরাও করে থাকেন তাদের স্ত্রী-বাচক শব্দ গঠন করতে পুরুষবাচক শব্দের পর 'ঈ', 'আনী', 'ইনি' প্রভৃতি যোগ করেই করা হয় ; কিন্তু যদি স্ত্রী পরিবারের

কাজই শুধু করে তবে তার স্ত্রীবাচক শব্দ গঠন করতে 'বৌ', 'মেয়ে' প্রভৃতি শব্দ পুরুষবাচক শব্দের পিছনে বসে।

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
বামুন	বামুন-বৌ, বামুনের মেয়ে, বামুন দিদি,
মুচি	মুচি-বৌ
নাপিত	নাপিত-বৌ, নাপিত দিদি
জেলে	জেলে-বৌ
ধোপা	ধোপা-বৌ।

পূর্বকালে একই বৃত্তি একই পরিবার৷ বংশ বংশ ধরে করে যেত; তাই সেই বৃত্তি অনুসারে 'জাতি' তৈরি হয়েছিল। আধুনিক সমাজে যে-কেউ যে-কোন বৃত্তি গ্রহণ করতে পারে। আজ যে কারখানায় কাজ করে সে শ্রমিক, দিন মজুরী নিয়ে যে কাজ করে সে মজুর। কিন্তু চিরকাল সে সেই কাজ করবে এমন কোন নিশ্চয়তা নেই; তার ছেলেমেয়েরা হয়ত সে কাজ করবে না। কাজেই বর্তমানে উপজীবিকা খুব তাড়াতাড়ি বদলে যায়, 'জাতি' হয়ে দাঁড়ায় না। যতক্ষণ কোন ব্যক্তি কোন বিশেষ বৃত্তি অবলম্বন করে তখন সে সেই শ্রেণীর লোক।

আবার একই লোক একই সময়ে বিভিন্ন ধরণের কাজ করতে পারে; যেমন একই ব্যক্তি কখনও শিক্ষক, কখনও লেখক, আবার কখনও করণিক বা কেরানী।

এইজন্য এইসব শব্দের স্ত্রীবাচক শব্দও সকলক্ষেত্রে তৈরি হয় নি, আবার কোন শব্দে স্ত্রী-কর্মীদেরই কেবল বোঝায়। এই দুই রকমের কয়েকটা শব্দ:

নার্স; কেরানী; ইঞ্জিনীয়ার; ডাক্তার; সভাপতি।

আধুনিক যুগের এইসব শব্দের মতো পুরনো যুগেও অনেকগুলি শব্দ ছিল; তার মধ্যে কয়েকটা:

মন্ত্রী; দুহিতা; সেনাপতি; বণিক; নাবিক; পুরোহিত।

॥ ১৪ ॥

পরিবারের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তির সঙ্গে প্রত্যেক ব্যক্তির সম্পর্ক থাকে। এই সম্পর্ক অনুসারে পুংলিঙ্গ আর স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের পার্থক্য হয়:

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
পিতা	মাতা
বাবা	মা

বাঁ দিকের শব্দগুলো পড়ে নীচের প্রশ্নের উত্তর লেখ:

১। বাবার সঙ্গে ঠাকুরমার সম্পর্ক কি?

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
কাকা	কাকীমা
খুড়া	খুড়ীমা
মামা	মামীমা
জ্যেঠামশায়	জ্যেঠিমা
ঠাকুরদাদা	ঠাকুরমা
দাদামশায়	দিদিমা
দাদা	দিদি
ভাই	বোন

বাঁ দিকের শব্দগুলো পড়ে নীচের প্রশ্নের উত্তর লেখ :

২। কাকার সঙ্গে কাকীমার সম্পর্ক কি ?

৩। মামার সঙ্গে মায়ের সম্পর্ক কি ?

৪। 'মা' শব্দ যোগে কোন্ কোন্ স্ত্রীবাচক শব্দ আছে ?

৫। কোনও পুরুষ এবং স্ত্রীকে 'বাবা' ও 'মা' বলে বাড়ীতে কারা ডাকতে পারে ?

নীচের নক্সা দেখে বল বাবার সঙ্গে কার কি সম্পর্ক ; মায়ের সঙ্গে কার কি সম্পর্ক :

ঠাকুরদাদা				ঠাকুরমা
দাদামশায়				দিদিমা
জ্যেঠামশায়				জ্যেঠিমা
বাবা	——→	[ছেলে মেয়ে]	←——	মা
কাকা				কাকীমা
মামা				মামীমা
মেসোমশায়				মাসীমা
পিসেমশায়				পিসীমা

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর কর (একই পরিবারের অর্থাৎ বাবা মা এবং তাঁদের ছেলে-মেয়েদের সম্পর্কে বলবে) :

বাবা ও মা তাঁদের ছেলেমেয়েকে এক কথায় কি বলবেন ?

ঐ ছেলেমেয়েদের পরস্পরের সম্পর্ক কি হবে ?

ছেলের সঙ্গে ছেলের এবং মেয়ের সঙ্গে মেয়ের কি সম্পর্ক হবে ?

ছেলেমেয়েদের মধ্যে যে ছেলেটি সবচেয়ে বড় তাকে অন্য ছেলেমেয়ে কি বলে ডাকবে ?

ছেলেমেয়েদের মধ্যে যে মেয়েটি সবচেয়ে বড় তাকে অন্য ছেলেমেয়ে কি বলে ডাকবে ?

॥ ১৫ ॥

পরিবারে এসে কাজকর্ম করে যে-সব বাইরের লোক তাদের স্ত্রীলিঙ্গ, পুংলিঙ্গ শব্দ আছে :

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
দাস	দাসী
বামুন	বামনী

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
চাকর	চাকরাণী, ঝি
পাচক	পাচিকা
ঠাকুর	রাঁধুনী

দাস-দাসী কথা এখনকার সমাজে আর ব্যবহৃত হয় না, তবে রূপকথা-উপকথায় পাওয়া যায়। কারণ এসব শব্দ প্রাচীন সমাজের রীতিতে চলত।

॥ ১৬ ॥

বয়স বোঝাতেও এমনি লিঙ্গ ভেদে শব্দের পার্থক্য আছে :

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
ছেলে	মেয়ে	যুবক	যুবতী
খোকা	খুকু	তরুণ	তরুণী
বালক	বালিকা	প্রৌঢ়	প্রৌঢ়া
কিশোর	কিশোরী	বৃদ্ধ	বৃদ্ধা

নীচের তালিকায় কতগুলো শব্দ দেওয়া আছে। পরে যে ছকটি দেওয়া হল, সেই ছক অনুযায়ী তালিকার শব্দগুলির উত্তর লেখ (একটির উত্তর দেওয়া আছে) :

কাকীমা, দিদিমা, বামুনদিদি, কনে, ঢাকীবৌ, পত্নী,
বৌদি, বৌমা, ননদ, পিসীমা

স্ত্রীবাচক শব্দ	প্রধানত কার সঙ্গে সম্পর্ক	কিরূপ সম্পর্ক	পুরুষবাচক শব্দ
বৌদি	বড় ভাইয়ের সঙ্গে সম্পর্ক	বড় ভাইয়ের স্ত্রী	দাদা

॥ ১৭ ॥

কতগুলো শব্দ আছে যাদের লিঙ্গ নির্ণয় করবার দরকার হয় না। এদেরকে বলা হয় উভয়লিঙ্গ। এইসব শব্দের কয়েকটা :

সন্তান, শিশু, বন্ধু।

কিন্তু 'শিশু' শব্দটি ছাড়া অন্য দুটির আগে 'মেয়ে' শব্দ যোগ করে স্ত্রীবাচক শব্দ তৈরি করা হয় : মেয়ে সন্তান ; মেয়ে বন্ধু

বন্ধু শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ সাধুভাষায় 'বান্ধবী' ; 'সখা'-র স্ত্রীলিঙ্গ শব্দও 'সখী'। কিন্তু এইগুলি এখন আর তেমন ব্যবহৃত হয় না।

অপ্রাণীবাচক শব্দগুলোকে ক্লীবলিঙ্গ শব্দ বলা হয় ; কাপড়, ফল, কাগজ প্রভৃতি।

নীচের শব্দের প্রত্যেকটি ব্যবহার করে পৃথক পৃথক বাক্য রচনা কর :

মেসোমহাশয়। কুড়ুল। শিশু। বর। পতি। দিদি। আম।

বামুনদিদি। পিসীমা ঢাকীবৌ। সন্তান। মেছুনী। জেলেনী।

শব্দগুলি কোন্ কোন্ লিঙ্গে ব্যবহৃত হয় লেখ।

॥ ১৮ ॥

সতীশ, শ্রীশ আর সুরেশ তিন ভাই। তাদের প্রত্যেকের ছেলেমেয়ে আছে। তিন ভাইয়ের ছোটবোন কাত্যায়নী। কাত্যায়নীর একটি ছেলে, অমরেশ। শ্রীশের স্ত্রীর নাম শৈল। শৈল-র বোন নলিনী। নলিনীর একটি মেয়ে আছে, তার নাম হাসি।

নীচের ছবির নির্দেশ অনুসারে লেখ শৈল-কে কে কিভাবে ডাকবে :

যারা ডাকবে	কিভাবে ডাকবে		যারা ডাকবে	কিভাবে ডাকবে
সতীশের ছেলেমেয়ে			কাত্যায়নী	
শ্রীশের ছেলেমেয়ে		শৈল-কে	নলিনী	
সুরেশের ছেলেমেয়ে			হাসি	
অমরেশ			সুরেশ	

॥ ১৯ ॥

॥ উদ্দিষ্ট নামপদের প্রসঙ্গে যে-পদ ব্যবহৃত হয় তাকে সর্বনামপদ বলে ॥

প্রথমভাগে তোমরা সর্বনাম কোন্‌গুলি তা পড়ে নিয়েছ। বচনও তোমাদের পড়া আছে। 'আমি', 'তুমি' 'সে' নানা রকমে বাক্যের মধ্যে আসে। নীচের ছকে এই সর্বনামগুলির বহুবচন লেখ :

উত্তম পুরুষ একবচন	উত্তম পুরুষ বহুবচন	মধ্যম পুরুষ একবচন	মধ্যম পুরুষ বহুবচন	প্রথম পুরুষ একবচন	প্রথম পুরুষ বহুবচন
আমি		তুমি		সে	
আমাকে		তোমাকে		তাকে	
আমার		তোমার		তার	

উত্তমপুরুষের একবচন আর বহুবচনে যতগুলি শব্দ আছে সবগুলির বর্ণ বিশ্লেষণ কর।

বর্ণবিশ্লেষণ করে বল বর্ণের দিক দিয়ে তাদের কতদূর পর্যন্ত মিল আছে।

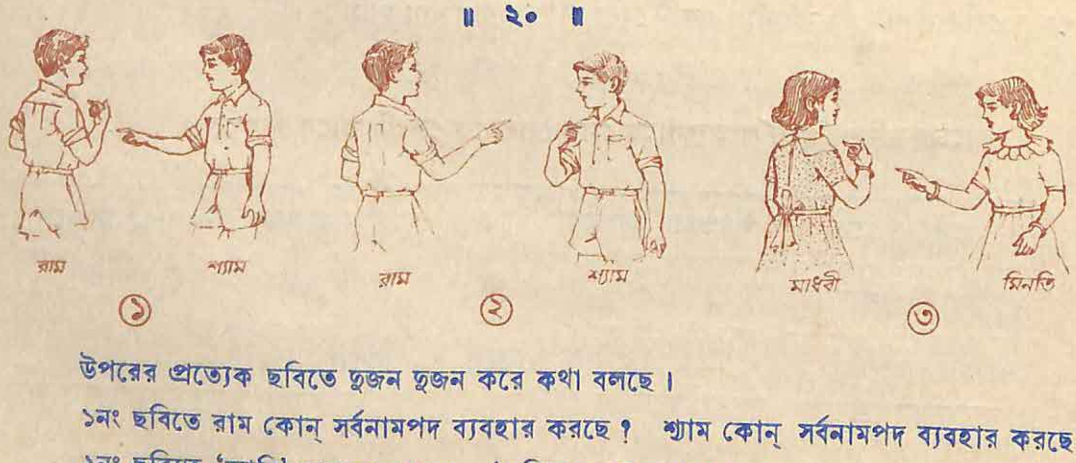
মধ্যমপুরুষের শব্দগুলির বর্ণ বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাবে অন্য সবগুলি সুরু হয়েছে ত্‌ + ও, কিন্তু প্রথমটির বেলায় শুধু ত্‌ + উ।

প্রথম পুরুষের শব্দগুলির কোন্‌টির সঙ্গে অন্যগুলি একটুও মিলছে না ?

'সে' শব্দের বদলে 'তা' (সাধু ভাষায়—তাহা) লিখলে কিন্তু এতটা অমিল থাকে না।

এইজন্য উত্তমপুরুষের 'আমি'-বাচক, মধ্যমপুরুষের 'তুমি' বাচক এবং প্রথম পুরুষের 'তাহা' বাচক শব্দ বলা হয়।

॥ ২০ ॥



① ② ③

উপরের প্রত্যেক ছবিতে দুজন দুজন করে কথা বলছে।

১নং ছবিতে রাম কোন্‌ সর্বনামপদ ব্যবহার করছে ? শ্যাম কোন্‌ সর্বনামপদ ব্যবহার করছে ?

২নং ছবিতে 'আমি' কে হয়ে গেল ? 'তুমি' কে হয়ে গেল ?

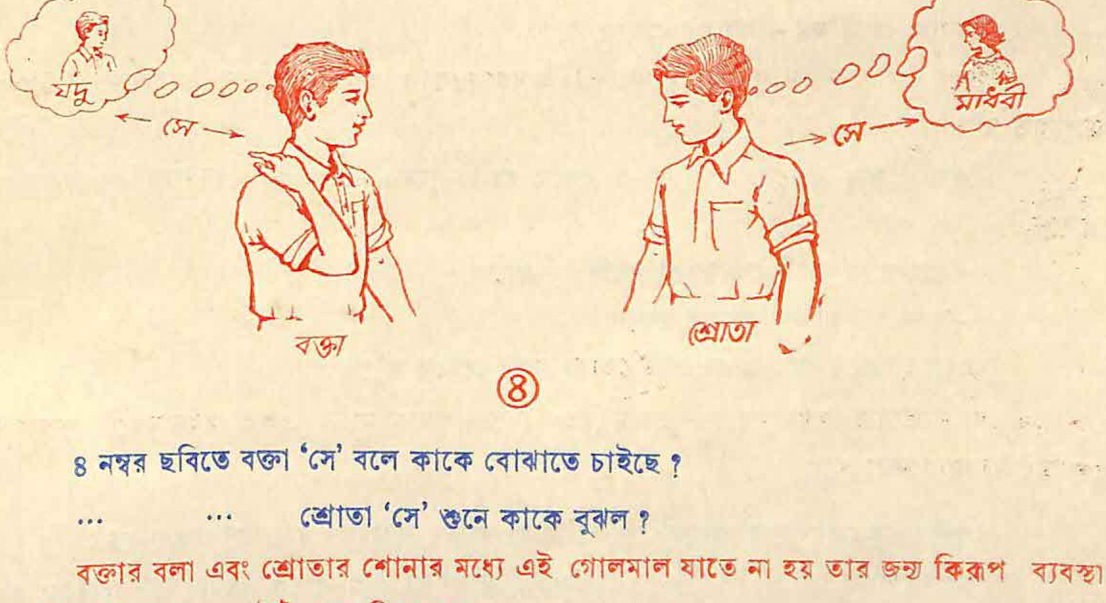
৩নং মাধবী আর মিনতি 'আমি' 'তুমি' বলতে কা'দের বোঝাচ্ছে ?

যে বক্তা সে নিজকে 'আমি' বলে, যে শোনে তাকে 'তুমি' বলবে। বক্তার নিজের দলকে 'আমরা' বলে, শ্রোতার দলকে 'তোমরা' বলে। রাম, শ্যাম, মাধবী, মিনতি—যে-কেউ এই সর্বনাম-পদ ব্যবহার করতে পারে।

বক্তা যে-কেউ হতে পারে, শ্রোতাও যে-কেউ হতে পারে। কথার মধ্য থেকেই তাদের চেনা যায়। তারা নিজেরা উপস্থিত থাকে।

॥ ২১ ॥

বক্তা আর শ্রোতা অনুপস্থিত কোন ব্যক্তি বা বস্তু সম্পর্কেও বলতে পারে। উদ্দিষ্ট অনুপস্থিত ব্যক্তি বা বস্তুর মধ্যে সে-ই হবে প্রথম পুরুষ। কিন্তু বক্তা আর শ্রোতা উভয়েই যেন সেই প্রথম পুরুষকে বুঝতে পারে।



④

৪ নম্বর ছবিতে বক্তা 'সে' বলে কাকে বোঝাতে চাইছে ?

... ... শ্রোতা 'সে' শুনে কাকে বুঝল ?

বক্তার বলা এবং শ্রোতার শোনার মধ্যে এই গোলমাল যাতে না হয় তার জন্য কিরূপ ব্যবস্থা হওয়া উচিত নীচের অংশ দুইটি পড়ে নিয়ে বল :

(১) সেদিন যদু আমাদের বাড়ীতে এল। মাধবী তখন খেতে বসেছে। সে আমাকে ইসারা করে কাছে ডাকল।

(২) সেদিন যদু আমাদের বাড়ীতে এল। মাধবী তখন খেতে বসেছে। সে বাড়ীতে এসেই আমাকে ইসারা করে কাছে ডাকল। মাথা দোলাচ্ছে একটা পুতুল। সে সেটা আমার হাতে দিল মাধবীকে দেবার জন্য। সে তখন খাওয়া ফেলে উঠে এসেছে।

১ নম্বর অংশের তৃতীয় বাক্যে 'সে' কাকে বোঝাচ্ছে ? স্পষ্ট হয় নি কেন ?

২ নম্বর অংশের তৃতীয়, পঞ্চম এবং ষষ্ঠ বাক্যে 'সে' কাকে বোঝাচ্ছে ? কি কি লক্ষণ দিয়ে বুঝতে পারলে ?

'সে-টা' বলায় কোন্‌টাকে বুঝতে পারা যাবে ?

প্রথম পুরুষের সর্বনাম ব্যবহার করবার আগে বিশেষ্যপদটি একবার উল্লেখ করলে উদ্দিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তুকে স্পষ্ট বোঝা যায়।

কিন্তু ১ নম্বর অংশে বিশেষ্যপদটি উল্লিখিত হয়েছিল। তবু গোলমাল হল, কারণ 'যত্ন' ব্যক্তির পর 'মাধবী' ব্যক্তি এসেছে, তারপর 'সে'। 'সে' মাধবীও হতে পারে, যত্নও হতে পারে। সে যে-বাক্যে ব্যবহৃত হয়েছে তার পূর্ব বাক্যেই 'মাধবী' রয়েছে ; অতএব এই 'সে' মাধবী হওয়া খুব সম্ভব। কিন্তু ২ নম্বর অংশে এই 'সে' দেখা যাচ্ছে 'যত্ন'কে বোঝানো হয়েছে ; যদিও 'সে'-র ঠিক আগে 'মাধবী' রয়েছে। বাক্যের অর্থ থেকে বুঝতে পারছি যত্ন-ই বাড়ীতে এল। অতএব 'সে বাড়ীতে এসেই' অর্থ 'যত্ন বাড়ীতে এসেই'।

বুঝবার এই প্রক্রিয়াকে বলে 'প্রসঙ্গ নির্ধারণ করে বুঝতে পারা'।

সর্বনাম পদ উদ্দিষ্ট নামপদের প্রসঙ্গে বসে।

উত্তম আর মধ্যম পুরুষের নামপদের প্রসঙ্গ দরকার হয় না, কারণ কথাবার্তায় নিজেরাই উপস্থিত থাকে।

কিন্তু 'ফোন' করতে গিয়ে তা-ও বলতে হয়। যেমন, রেফাতুল্লা রঘুদাস সফায়াকে ডেকে বলছে,

—হ্যালো ! আমি রেফাতুল্লা বলছি। হ্যালো !

—বলুন। আমিই রঘুদাস সফায়া।

এখানে বলতে হল, কারণ কেউ তো কাকেও দেখতে পাচ্ছে না !

বাংলাভাষায় সর্বনামপদের কোন লিঙ্গ বিভেদ থাকে না। একই সর্বনাম স্ত্রী পুরুষ উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা যায়।

প্রাণীবাচক নামপদের প্রসঙ্গে 'সে' বা 'তাহা-বাচক' সর্বনাম পদ ব্যবহার করা হয় ;

অপ্রাণীবাচক ... ... সে-টা, সে-সব বা তাহা-বাচক সর্বনাম পদ ব্যবহৃত হয়।

প্রাণী এবং অপ্রাণী যদি খুব কাছে থাকে তবে সর্বনাম পদ হবে—এ, এই, ইহা, এটা প্রভৃতি ;

... ... দূরে থাকে তবে সর্বনাম পদ হবে,—ও, ওই, উহা, ও-টা প্রভৃতি।

সম্মান করে বলতে গেলে মধ্যমপুরুষের সর্বনামে হবে 'আপনি' এবং প্রথম পুরুষে 'তিনি'-বাচক শব্দ।

খুব ঘনিষ্ঠ হলে মধ্যম পুরুষে 'তুমি'-র বদলে 'তুই' হয়।

॥ ২২ ॥

নীচের অংশগুলি পড়ঃ

(১) বাবা বলেছিলেন, তানসেন খুব বড় গায়ক ছিলেন। তিনি সম্রাট আকবরের রাজসভায় গান করতেন।

(২) মা দাদাকে বললেন, তুই মাষ্টারমশাইকে বলবি যে, বিকেলে তুই আমাদের সঙ্গে বেড়াতে যাচ্ছিস ; আজকে তিনি যেন তোকে পড়াতে না আসেন।

(৩) —বরেনদা! আপনি বিড়ালটাকে দেখেছেন ?
—ওই-টা ?
—দেখেছেন কাণ্ড! ওটা উনুনের ধারে বসে আছে !

(৪) —তোদের বাগানে একটা লাউ দেখেছিলাম। আছে সে-টা ?
—তা কি আর আছে! খেয়ে ফেলেছি।

(৫) তাঁর বই পড়তে আমার খুব ভালো লাগে ; শরৎচন্দ্রের কথা বলছি।

পাঁচটি অংশে যে সর্বনামপদগুলো পেয়েছ নীচের ছকে নির্দেশমতো সেগুলির পরিচয় দাও :

অংশের নম্বর	সর্বনাম পদ	কাকে বোঝাচ্ছে	কোথায় আছে (১) সামনে (২) দূরে	সামনে উপস্থিত কি অনুপস্থিত	কোন পুরুষ

॥ ২৩ ॥

নাম পদে কোন বিশেষ ব্যক্তি বা বস্তুকেই বোঝা যাবে। যেমন, 'সূর্য' বললে আমরা একটি সূর্যকেই বুঝে থাকি ; রামরাজ সিং বললে সেই নামের ব্যক্তিকেই বুঝব, পল সাহেবকে বুঝব না ; আম বললে আম ফলকেই বুঝব, কাঁঠালকে নয়।

যে-পদ যে-কোন ব্যক্তি বা বস্তুর প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হয় তাকে সর্বনাম পদ বলে।

নাম পদের মতোই সর্বনাম পদেরও বচন, কারক (প্রথম ভাগ দেখ) অনুযায়ী কিছুটা বদল হয়, কিন্তু বাংলাভাষায় সর্বনাম পদ নাম পদের মতো লিঙ্গ অনুসারে পরিবর্তিত হয় না, পুরুষ অনুসারে হয়।

নীচের ছক থেকে নাম পদ (বিশেষ্যপদ) এবং সর্বনাম পদের সম্পর্কে কি বলা হয়েছে তা বুঝে নিয়ে খাতায় বর্ণনা কর :

	নামপদ	সর্বনামপদ
সংজ্ঞা	বাক্যের যে পদে কোন কিছুর নাম বোঝায়	নামপদের প্রসঙ্গে যে পদ ব্যবহৃত হয়
পুরুষ	প্রয়োজন হয় না	উত্তম, মধ্যম, প্রথম
লিঙ্গ	পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ, ক্লীবলিঙ্গ, (উভয় লিঙ্গ)	সব লিঙ্গে একই পদ ; প্রসঙ্গ অনুসারে বুঝে নিতে হয়
বচন	একবচন, বহুবচন	একবচন, বহুবচন।
কারক	কারক অনুযায়ী বিভক্তি যুক্ত হয়	কারক অনুযায়ী বিভক্তি যুক্ত হয়, কিন্তু কর্তৃ-কারকের কোন বদল হয় না

॥ ২৪ ॥

[বচন]

প্রথমভাগে তোমরা বচন পড়েছ। বচন দু রকমের—একবচন এবং বহুবচন। বিশেষ্য এবং সর্বনামেরই বচনে কিছু পরিবর্তন হয়। অন্য কোন পদে বচন নেই।

একবচনে মূল শব্দটিই থাকে। কিন্তু বহুবচনে বাংলায় 'রা', 'এরা' প্রভৃতি শব্দচিহ্ন যুক্ত হয়। তা ছাড়া সব, সকল, গণ, কুল প্রভৃতি শব্দও পৃথকভাবে বসে 'বহু' বুঝিয়ে থাকে। বাংলাতে

সব, সকল, গুলি, গুলা গুলো, দের, দিগের, রা, এরা—শব্দগুলিই বহুবচন বোঝাতে বেশি ব্যবহৃত হয়। কিন্তু একটার বদলে আর একটা ব্যবহার করা চলে না। যেমন, 'গাছের পাতারা উড়ে যাচ্ছে' না বলে বলতে হবে 'গাছের পাতাগুলি উড়ে যাচ্ছে।'

নীচের বাক্যগুলির বহুবচনে কিরূপ পরিবর্তন হবে ডানদিকে ঠিক করে লেখ :

(১) তুমি সকলে ভাত খেতে এস	(১) ... ...
(২) গাছেরা মরে গেল	(২) ... ...
(৩) আমিদেরকে ডেকে নিয়ে যেও	(৩) ... ...
(৪) ফুলগণ ঝরে পড়ছে	(৪) ... ...
(৫) মারা সন্তানকে স্নেহ করেন	(৫) ... ...

উপরে যে বাক্য পাঁচটি লেখা রয়েছে তার মধ্যে কোন্‌টি কি রকম নীচের নির্দেশ অনুসারে লেখ :

(১) শুনলে হাসি পায়, কারণ বাঙালীরা কেউ এ রকম বলে না।

(২) শুনলেই মনে হয় মানুষের মতো আচরণ যেন এই সব বস্তুর।

(৩) বানান ঠিক না হওয়ার জন্য অন্য রকম অর্থ বোঝাতে পারে।

নীচের বাক্যগুলি পড়ে বল বিশেষ্যপদগুলি যে বহুবচন তা কি কারণে বোঝা যায় ; যে সব শব্দের অর্থ জান না, অভিধান থেকে দেখে নাও।

(৬) বন্ধুমহলে ভদ্রলোকটির খুব খাতির ॥	'বন্ধু' শব্দ বহুবচন, কারণ ... ...
(৭) শ্রীচৈতন্যদেব এমন সময় পণ্ডিত-সভায় উপস্থিত হলেন ॥	'পণ্ডিত' শব্দ বহুবচন, কারণ ... ...
(৮) কৃষকমণ্ডলী সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন ॥	'কৃষক' শব্দ বহুবচন, কারণ ... ...
(৯) বড় বড় গাছের আড়ালে ঋষির পর্ণকুটীর ॥	'গাছ' শব্দ বহুবচন, কারণ ... ...
(১০) বনে বনে সাড়া জেগে গেল ॥	'বন' শব্দ বহুবচন, কারণ ... ...
(১১) পুরোহিত নামাবলী গায়ে জড়ালেন ॥	'নামাবলী' বহুবচন, কারণ ... ...

॥ ২৫ ॥

[সম্বন্ধপদ]

নীচের লেখাগুলো পড় :

১। তোমার নাম ছবি
আমার নাম রবি।
টুক্ করে মিলে গেল,
রক্ষা পেল কবি। (রবীন্দ্রনাথ)

২। কথা কুড়িয়ে খাতার পাতা ভরা
সত্য নিয়ে এ শুধু খেলা করা। (রবীন্দ্রনাথ)

৩। আকাশে সোনার মেঘ
কত ছবি আঁকে
আপনার নাম তবু
লিখে নাহি রাখে। (রবীন্দ্রনাথ)

৪। জানলার ধারে বসে আছি।

৫। যত বেলা বাড়ে রোদের তাত তত বাড়ে।

৬। শনি গ্রহের আয়তন পৃথিবীর সাড়ে সাতশ গুণের সমান।

৭। মশার উপদ্রবে সন্ধ্যেবেলা পড়াশুনা করা যাচ্ছে না।

৮। সোনার থালায় খাওয়াও যা, কলার পাতায় খাওয়াও তাই ; ক্ষুধা মিটলেই হলো।

৯। জেলেরা নদীর তীরে বাস করে।

১০। পূজার বাজনা বাজছে।

১১। অত্যাচার করবার জন্যে যে বিচার করা হয় তাকে 'কাজীর বিচার' বলে।

১২। কিছু করলেও দোষ, না করলেও দোষ—এই উভয়-সঙ্কটে যে পড়ে সে আক্ষেপ করে বলে, এ যেন শাঁখের করাত। কারণ, এই করাতে যেতেও কাটে আসতেও কাটে।

১৩। শীতকালে ফুলকপির সিঙাড়া পাওয়া যায়।

১৪। সবিতাব্রত কৃষ্ণনগরে মামার বাড়ীতে গিয়েছে।

নীচের ছকে নির্দেশমতো উত্তর লেখ ; কত নম্বরের লেখা থেকে প্রশ্ন করা হয়েছে তা বাঁ দিকে লেখা নম্বর দেখে আগের পৃষ্ঠায় পড়ে নাও, তারপর উত্তর লেখ।

যে-নম্বরের লেখা	প্রশ্ন	লেখা থেকে শব্দটি লেখ	কি পদের শব্দ ?	কি বিভক্তি ঐ শব্দে আছে ?
১	কার নাম রবি ?			
২	কিসের পাতা ?			
৩	কি (রঙের) মেঘ ?			
৪	কিসের ধারে ?			
৫	কার আয়তন ?			
৬	কার সমান ?			
৭	কিসের উপদ্রব ?			
৮	কিসের তৈরি থালা ?			
৯	কার তীরে ?			
১০	কি জন্য বাজনা ?			
১১	কে বিচার করে ?			
১২	কি কাটবার জন্য করাত			
১৩	কিসের তৈরি সিঙাড়া			
১৪	কার বাড়ী ?			
৮	কিসের পাতা ?			

উপরের উত্তরগুলি ভালো করে মিলিয়ে নিলে দেখা যাবে, বিশেষ্য বা সর্বনামপদের সঙ্গে -র, -এর বিভক্তি যুক্ত হয়েছে। এই বিভক্তিযুক্ত পদের পর আর একটি বিশেষ্য থাকে। পরবর্তী বিশেষ্যের সঙ্গে আগেরটির অর্থগত সম্বন্ধ আছে। সেই অর্থ (ছকের) প্রশ্নের উত্তরে পাওয়া যায়।

'কাছে বা নিকটে' এই সম্বন্ধ বোঝাতে বিভক্তিযুক্ত হয়েছে ৪ এবং ৯ নম্বরে।

'অধিকার' এই সম্বন্ধে বুঝিয়েছে ১ এবং ১৪ নম্বরে।
'অংশ' ... ... ২ এবং ৮ নম্বরে।
'নিমিত্ত বা জন্য' ... ... ১০ এবং ১২ নম্বরে।
'যা দিয়ে তৈরি' ... ... ৮ এবং ১৩ নম্বরে।
'কে করে' ... ... ৭ এবং ১১ নম্বরে।
'কার্যের কারণ' ... ... ৫ নম্বরে।
'তুলনা বা সমান' ... ... ৩ এবং ৬ নম্বরে।

দুইটি বিশেষ্যের মধ্যে কোন প্রকারের সম্বন্ধ বোঝাতে প্রথম বিশেষ্য (বা সর্বনাম) পদে 'র' এবং 'এর' বিভক্তি যোগ করতে হয়।

সম্বন্ধ বোঝায় বলেই এই বিভক্তিযুক্ত পদকে বলে সম্বন্ধ পদ।

নীচের লেখাটি থেকে সম্বন্ধপদগুলি নির্দেশ কর ; ঐ সম্বন্ধ পদে কি রকম অর্থ বুঝিয়েছে তা পৃথক পৃথক ভাবে লেখ ঃ

বাষ্পীয় ইঞ্জিন একদিনে যেমন হঠাৎ তৈরি হয়নি তেমনি একজনের হাতেও নয়।

অনেক যন্ত্র-কুশলীর অনেক দিনের চেষ্টার ফল এই বাষ্পীয় ইঞ্জিন। তবে অনেকের মতে জর্জ স্টিফেনসনের একমাত্র পুত্র রবার্টের ইঞ্জিনই ভালো। রবার্টের আগে রিচার্ড ট্রেভিথিক যে ইঞ্জিন করেছিলেন তার অনেক দোষ ছিল।

যে-সব ইঞ্জিনের বয়লার (যেখানে জলকে ফুটিয়ে বাষ্প করা হয়) তার সিলিণ্ডারে (বেলনা আকারের অংশটি) যথেষ্ট পরিমাণে উচ্চ চাপ এবং তাপের বাষ্প অবিরত যোগাতে পারে সেই সব ইঞ্জিনের শক্তিই বেশি।

ট্রেভিথিকের ইঞ্জিনের এমন শক্তি ছিল না, রবার্ট স্টিফেনসনের 'রকেট' (১৮২৯ খৃষ্টাব্দের) এবং 'প্ল্যানেটের (১৮৩০ খৃষ্টাব্দের) সেই রকমের শক্তি ছিল।

॥ ২৬ ॥

[সম্বোধন পদ]

১। রাম! এদিকে একবার এস তো!
২। ওহে! কোথায় যাচ্ছ?
৩। আরে! তুমি এলে কখন?
৪। হেদে গো কলমী লতা!
এতকাল ছিলি কোথা!

আগের পৃষ্ঠার বাক্য চারটি পড়ে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর লেখ :

১। প্রথম বাক্যে কাকে ডাকা হয়েছে ?

২। চতুর্থ বাক্যে কাকে ডেকে প্রশ্ন করা হচ্ছে ?

৩। দ্বিতীয় আর তৃতীয় বাক্যে নাম ধরে না ডেকে অন্য কোন্ শব্দ দিয়ে ডাকা হয়েছে ?

৪। প্রথম বাক্যটি যদি বদলে লেখা যেত 'রাম এদিকে একবার আসছে।' তবে ডাকবার ভঙ্গি থাকত না কেন ?

কাউকে নাম ধরে ডাকতে হলে একটা বিশেষ সুর করতে হয়। দূরে কেউ থাকলে তবে সম্বোধন করা যায়। এই জন্য একটা ভঙ্গি আসে।

নাম না ধরেও সম্বোধন করা যায় যদি 'ওহে' 'হেদে গো', প্রভৃতি শব্দ আগে যুক্ত হয়। এই শব্দগুলিকে অব্যয় পদ বলে। (প্রথম ভাগে অব্যয় পদ আরও কয়েকটা আছে, দেখে নাও)।

সম্বোধন করতে হলে বাক্যটির কর্তা শেষ পর্যন্ত সর্বনামের মধ্যম পুরুষ হয়ে দাঁড়ায়।

যে-পদে কাউকে ডাকা হয় তাকে সম্বোধন পদ বলে। সম্বোধন পদের সঙ্গে বাক্যের অন্য কোন পদের বিশেষ সম্বন্ধ থাকে না ; সমগ্র বাক্য থেকে এই পদ পৃথক্ হয়ে থাকে ; এই পদের পরে '!' এইরূপ চিহ্ন দেওয়া উচিত।

॥ ২৭ ॥

[সম্প্রদান কারক]

বাস করবার স্থানকে বলা হয় বাড়ী, বাসা। নিজেরাই যে-স্থানের মালিক তাকেই সাধারণত বাড়ী বলে থাকি ; আর ভাড়া দিয়ে যেখানে থাকতে হয় তাকে বলে থাকি বাসা।

বহুকাল ধরে যে-বাড়ীতে বাস করা যায় সেই বাড়ীকে বাস্তুভিটা বলে। বসবাস করার ঘর-বাড়ী জায়গা-জমিকেই বাস্তু বলে।

নিজের বাড়ী বা বাস্তু সহজে কেউ ছেড়ে যায় না। অসুবিধার দরুণ লোকে বাস্তুত্যাগ করে, দায়ে পড়েও করে। দুর্ভিক্ষ হলে (যখন খরায় বা বর্ষায় খাবার বহুদিন মেলে না), বন্যায়, ঝড়ে, নদীর ভাঙনে বাড়ী ঘর-দুয়ার ভেঙে গেলে লোকে বাস্তুত্যাগী হয়।

মানুষের অত্যাচারেও অনেককে বাস্তুত্যাগ করতে হয়। এরা যখন ঘর-দুয়ার ছেড়ে অন্যত্র চলে যায়, এদের তখন বলা হয় উদ্বাস্তু। বড়লোক গরীবকে উদ্বাস্তু করে ; রবীন্দ্রনাথের 'দুই বিঘা জমি' কবিতায় উপেনকে জমিদার উদ্বাস্তু করেছিল ; পূর্ববঙ্গ থেকে কিছু লোকের বিদ্বেষ ও হিংসার ফলে অনেকে উদ্বাস্তু হয়েছিল, ইদানীং পাক-সেনাদের অত্যাচারে বহুলোক উদ্বাস্তু বা বাস্তুহারা হয়ে পশ্চিমবঙ্গে এসেছিল।

চন্দনদের গ্রাম পশ্চিমবঙ্গে। সেই গ্রামের সুরেনবাবু বেশ অবস্থাপন্ন ব্যক্তি। তাঁর কয়েক বিঘা জমি ছিল (প্রতি বিঘার আয়তন ১৬০০ বর্গ গজ)। সেই সব জমি তিনি বাস্তুহারাদের দান করে দিলেন। এখন তিনি হরিদ্বারে কোন এক আশ্রমে বাস করেন। চন্দন তাই সুরেনবাবুকে হর্ষবর্ধন বলে (ইতিহাস থেকে দেখে নাও হর্ষবর্ধন কে ছিলেন)।

উপরের অংশটি পড়ে নীচের প্রশ্নের উত্তর লেখ :

১। বাস্তুভিটা কাকে বলে? ২। উদ্বাস্তু বা বাস্তুহারা মানুষে কখন কিভাবে হয়? ৩। উপেনকে কে উদ্বাস্তু করেছিল? ৪। পূর্ববঙ্গ থেকে লোকে কেন বাস্তুহারা হয়ে পশ্চিমবঙ্গে এসেছে? ৫। সুরেনবাবু কোথায় থাকতেন? ৬। তিনি উদ্বাস্তুদের জন্য কি করেছিলেন? ৭। সুরেনবাবুকে বাস্তুহারা বলা যাবেনা কেন? ৮। হর্ষবর্ধন কে ছিলেন? ৯। কি কারণে চন্দন সুরেনবাবুকে হর্ষবর্ধন বলেছে? ১০। মহাভারতে কাকে সবচেয়ে বড় 'দাতা' বলা হয়? ১১। দাতা কাকে বলা হয়? ১২। দোকান থেকে জিনিস কিনে তার পয়সা দিলে তাকে দাতা বলা যায় না কেন?

॥ ২৮ ॥

কিছু দিলেই 'দান করা' হয় না। কেউ যদি ইচ্ছা করে কোন জিনিস অন্য ব্যক্তিকে একেবারে চিরতরে বিনাসর্তে দিয়ে দেয়,—তবেই তাকে দান বলা যায়। জোর করে কারো কাছ থেকে কোন জিনিস নিলে—সে 'দান করেছে' একথা বলা যাবেনা।

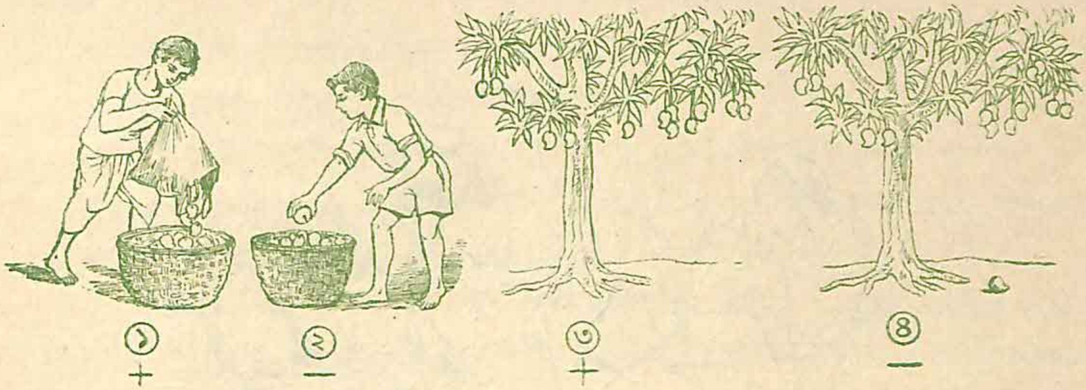
নীচের বাক্যের কোন্‌গুলিতে দান করা অর্থ বোঝাচ্ছে?

১। ডাকাতকে সব গহনা দিয়ে দাও। ২। কপালকুণ্ডলা ভিখারীকে সব গহনা দিয়ে দিল। ৩। ধোবাকে কাপড় দিচ্ছি। ৪। আহা! বেচারী খেতে পায়নি, ওকে কিছু খেতে দাও। ৫। গোপালবাবু চাকরকে মাহিনা দিচ্ছেন।

যাকে দান করা হয় সেই বিশেষ্য বা সর্বনামপদের সম্প্রদান কারক হয়। সম্প্রদান কারকে '—কে' বিভক্তি যোগ করা হয়।

॥ ২৯ ॥

[অপাদান ও অধিকরণ কারক]



১। প্রত্যেক ছবিতে কি কি বলা হচ্ছে ?

২। যোগ অঙ্ক আর বিয়োগ অঙ্কের মধ্যে পার্থক্য কি ?

৩। নীচের দুটি অঙ্ককে বাক্যে প্রকাশ কর :

১২৫ + ২০ ; ৮০ − ৫০

৪। নীচের বাক্য দুটি কত নম্বরের ছবিতে বোঝাচ্ছে ?

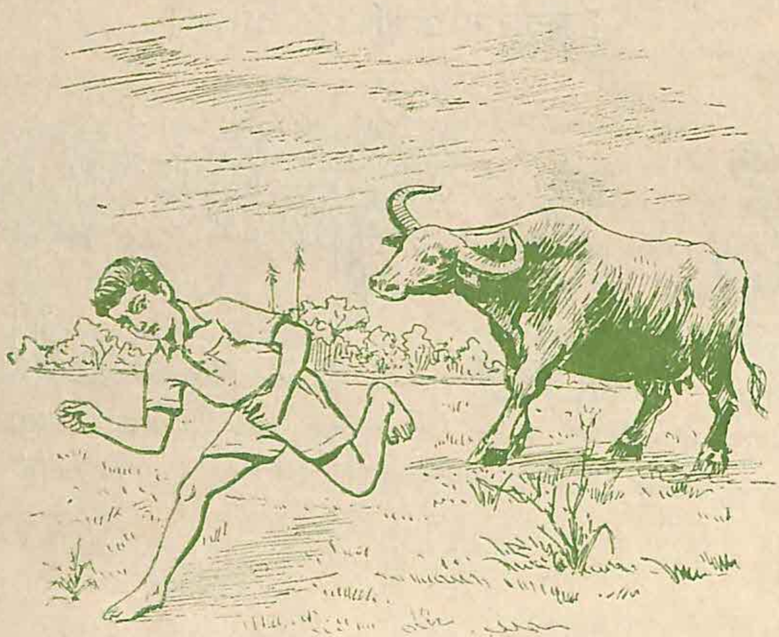
গাছে ফল আছে। গাছ থেকে ফল পড়ছে।

৫। ১ নম্বর ছবির থলি আর ঝুড়ির মধ্যে কোন্‌টিতে আম 'বিয়োগ' করা হচ্ছে আর কোন্‌টিতে 'যোগ' করা হচ্ছে ?

যোগ বা যুক্ত করা অর্থ বোঝালে যাতে যুক্ত হয় সেই বিশেষ্য বা সর্বনামটির অধিকরণ কারক হয়। অধিকরণ কারকের চিহ্ন '—তে' বা '—এ' বিভক্তি।

বিয়োগ অর্থ বোঝালে যা থেকে বিচ্যুত হয় সেইটি অপাদান কারকের হয় : অপাদান কারকে '—এ' বিভক্তি হতে পারে, আবার হইতে, হতে, থেকে এইসব বিভক্তি-শব্দও (যে সব শব্দ বিভক্তি নয় কিন্তু বিভক্তির মতো কাজ করে) যুক্ত হতে পারে।

॥ ৩০ ॥



১। বাবলু মহিষ থেকে ভয়ে অস্থির। ২। বাবলু মহিষের ভয়ে অস্থির। ৩। বাবলু মহিষ হতে ভয় পেয়ে অস্থির। ৪। বাবলু মহিষ দেখে ভয়ে অস্থির।

উপরের বাক্য কয়টি পড়ে দেখ, ৩ নম্বর বাক্যটি আমরা সচরাচর বলি না; আমরা ২ নম্বর এবং ৪ নম্বর বাক্যই ব্যবহার করি বেশি। কিন্তু অর্থ সবই এক।

মহিষ দেখে ভয় পায় কেন? মহিষ শিং দিয়ে গুঁতোতে পারে, মহিষ গায়ের উপর এসে পড়তে পারে, এইসব ঘটনা মনে জাগে। মহিষের কতগুলো আচরণ থেকেই এইসব ভয় তৈরি হচ্ছে। কাজেই 'জাত' অর্থেও বিযুক্তি বোঝায়, তাই 'মহিষ থেকে', 'মহিষের' 'মহিষ হতে' অপাদান কারক। এমন কি 'মহিষ দেখে'-র 'মহিষ' শব্দটিও অপাদান কারকের হতে পারত, কিন্তু 'দেখা' ক্রিয়া পদটির জন্য হতে পারল না, কর্মকারক হয়ে গেল।

নীচের বাক্যগুলিতে অপাদান কারক কোন্‌গুলি? ঐগুলি অপাদান কারক হল কেন?

৫। বীজ থেকে অঙ্কুর হয়। ৬। হিমালয় থেকে গঙ্গা আসছে। ৭। অন্যায় থেকে দূরে থাক। ৮। শিক্ষকের কাছ থেকে অঙ্কটা জেনে নাও।

॥ ৩১ ॥

১। পঞ্চবটী বনে সে সাধনা করছে। ২। লেখাপড়ায় তার খুব মন আছে। ৩। তিলে তেল আছে।

১ নম্বর বাক্যে—পঞ্চবটি বনের কোন একস্থানে সে সাধনা করে, পঞ্চবটী বনটা জুড়ে সে সাধনা করে না।

২ নম্বর বাক্যে—'লেখাপড়া করা' একটা বিষয়, সেই বিষয়ে তার মন আছে।

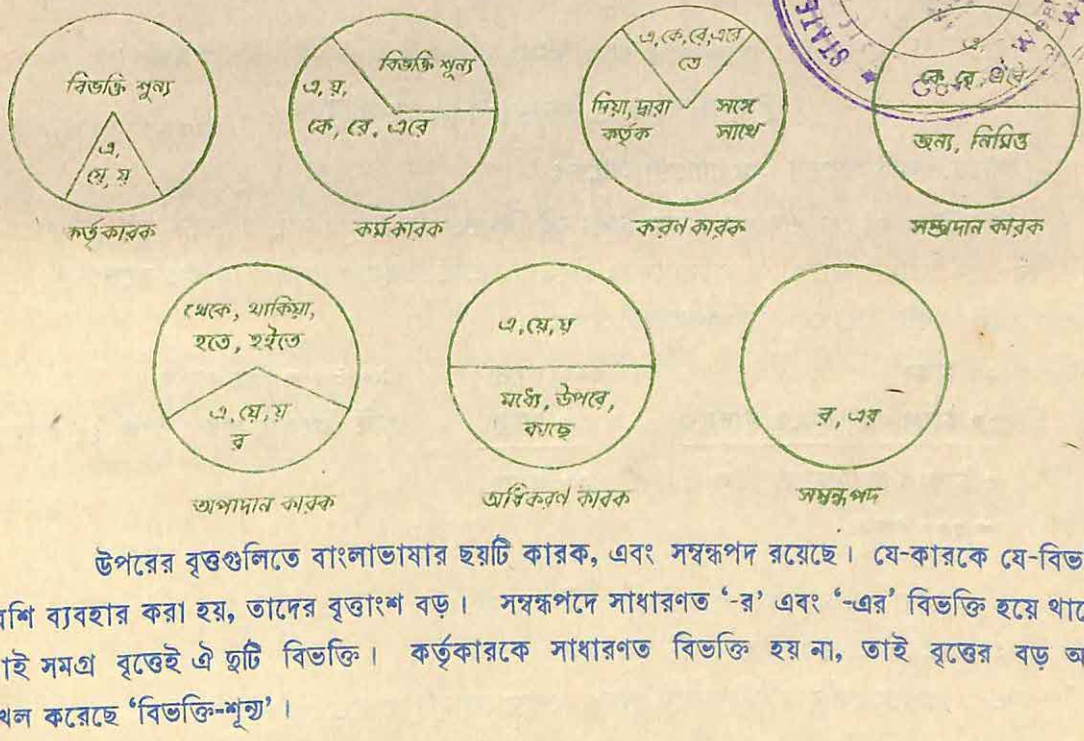
৩ নম্বর বাক্যে—তিলের সমগ্র অংশেই তেল থাকে।

এগুলির সবই অধিকারণ কারকে ব্যবহৃত হয়েছে ; বনে, লেখাপড়ায়, তিলে।

উপরের তিনটি বাক্যের মতো নীচের বাক্যগুলির কোন্‌টি কোন্‌ অর্থে অধিকরণ কারক হয়েছে ?

৪। বিজ্ঞানে তার খুব অনুরাগ। ৫। তারা কলকাতায় থাকে। ৬। তিনি বাড়ীতে আছেন। ৭। ইংরেজি পড়ায় তার একেবারেই মন নেই। ৮। বায়ুতে অক্সিজেন আর নাইট্রোজেন আছে। ৯। এই পুকুরে একটা রুই মাছ আছে।

॥ ৩২ ॥



উপরের বৃত্তগুলিতে বাংলাভাষার ছয়টি কারক, এবং সম্বন্ধপদ রয়েছে। যে-কারকে যে-বিভক্তি বেশি ব্যবহার করা হয়, তাদের বৃত্তাংশ বড়। সম্বন্ধপদে সাধারণত '-র' এবং '-এর' বিভক্তি হয়ে থাকে, তাই সমগ্র বৃত্তেই ঐ দুটি বিভক্তি। কর্তৃকারকে সাধারণত বিভক্তি হয় না, তাই বৃত্তের বড় অংশ দখল করেছে 'বিভক্তি-শূন্য'।

করণ, অপাদান এবং অধিকরণে বিভক্তি-শব্দের বৃত্তাংশের পরিমাণ লক্ষ্য কর। সম্বন্ধপদ ছাড়া '-এ' বিভক্তি প্রায় সব কারকেই আছে।

নীচের বাক্যগুলি থেকে কোন্ পদের কোন্ কারক এবং তার বিভক্তি এবং বিভক্তি-শব্দগুলি লেখ :

১। আমি পড়ছি। ২। ছাগলে বাগানটা খেয়ে ফেলছে। ৩। সে আমাকে ডাকছে। ৪। জেট বিমানে সে বিলেতে গেল। ৫। শোভনলাল তুলি দিয়ে লেখে। ৬। বিশ্বনাথ তার বাবার শাল ভিখারীকে দিয়ে দিল। ৭। মৌচাকে মধু থাকে। ৮। জাল থেকে মাছটা লাফিয়ে পড়ল। ৯। আমায় কিছু বলবে ? ১০। চীনা বাদামেও তেল আছে। ১১। দায়ে তামাক কাট। ১২। তাকে আমি আমার বইটা দেব। ১৩। পিঁপড়েটা মার। ১৪। আরশোলাটাকে মার না কেন ?

নীচের প্রশ্নের উত্তর লেখ :

(ক) কোন্ প্রকার পদের কারক হয় ?

(খ) বিভক্তি কয়টির নাম লেখ।

(গ) কারক কয় প্রকারের ?

॥ ৩৩ ॥

[সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়া]

নীচে একটি প্রশ্নের অঙ্ক দেওয়া আছে :

কুড়ি টাকার মধ্যে দাদাকে পনের টাকা বই কিনতে দিয়ে তুমি বাজার থেকে দুই কিলোগ্রাম চাল কিনে এনে তোমার মাকে দশ পয়সা ফেরৎ দিলে। প্রতি কিলো চালের দাম কত পড়েছে ?

এই অঙ্কটা রীণা যে-ভাবে করল তা দেখ :

২০ টাকা	৫০০ পয়সা	৪৯০ ÷ ২ = ২৪৫ পয়সা
১৫ টাকা বই কিনতে দাদাকে	১০ পয়সা	প্রতি কিলোর দাম ২ টাকা ৪৫ পয়সা।
৫ টাকা চাল কিনতে রইল	৪৯০ পয়সা	
= ৫০০ পয়সা.		

১। রীণা একটা অঙ্ক করতে গিয়ে কয়টি অঙ্ক করল ?

২। একটি প্রশ্নের অঙ্কে কয়টি অঙ্ক ছিল ?

৩। প্রথমে কোন্ অঙ্কটি করতে হল ? শেষে কোন্‌টি করতে হল ?

প্রশ্নের অঙ্ক করতে গিয়ে আগে কোন্‌টা করতে হবে পরে কোন্‌টা করতে হবে তা ঠিক করে নিতে হয়। কারণ, যা করতে হচ্ছে সেগুলো ঘটনা। একটি ঘটনার পর আর-একটি ঘটনা ঘটছে।

বাক্যেও এমনি একটি ঘটনার পর আর একটি-ঘটনা থাকতে পারে।

(ক) বাড়ীতে এসে খেলবে। (খ) বাড়ীতে এসে খাবার খেয়ে খেলবে। (গ) খেলা শেষ করে হাত-মুখ ধুয়ে বই নিয়ে পড়বে।

৪। উপরের বাক্য তিনটির প্রত্যেকটিতে ক'টি করে ঘটনা আছে?

৫। কোন্ ঘটনা আগে ঘটছে?

॥ ৩৪ ॥

(১) আমি বাড়ী ফিরে স্নান করব। (২) আমি বাড়ী ফিরে স্নান করে সরবত খাব।

উপরের বাক্য দুটি যদি ঘটনানুক্রমে সাজাই তা হলে নীচের মতো হবে:

১ নম্বর বাক্যে—(ক) আমি বাড়ী ফিরব। (খ) তারপর স্নান করব।

২ নম্বর বাক্যে—(গ) আমি বাড়ী ফিরব। (ঘ) তারপর স্নান করব। (ঙ) তারপর সরবত খাব।

১ নম্বর বাক্যটির ঘটনা ঠিক করে ২টি বাক্য পেলাম। ক্রিয়া দুটি, কর্তা একই (আমি)।

২ নম্বর বাক্যটির ঘটনা ঠিক করে ৩টি বাক্য পেলাম। ক্রিয়া তিনটি, কর্তা একই (আমি)।

৩৩ নম্বর পাঠের ক, খ, গ বাক্যকে এমনি করে ভাগ করে দেখাও।

॥ ৩৫ ॥

১। তুমি অঙ্ক কষে ইংরেজি পড়। ২। তুমি অঙ্ক কষলে আমি ইংরেজি পড়ব।

উপরের বাক্য দুটির পার্থক্য বুঝতে গেলে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর খুঁজে বের করতে হবে:

(ক) ১ নম্বর বাক্যে কর্তা ক'জন? (খ) দু নম্বর বাক্যের কর্তা ক'জন? (গ) ১ নম্বর বাক্যের প্রথম ঘটনার ক্রিয়াপদ কি? (ঘ) ২ নম্বর বাক্যের প্রথম ঘটনার ক্রিয়াপদ কি? (ঙ) উভয় ক্রিয়াপদের বর্ণ বিশ্লেষণ করলে কি প্রভেদ পাওয়া যাবে?

উপরের বাক্য দুটিকে সাধুভাষায় লেখ।

॥ ৩৬ ॥

তুই চল্। তুই ভাত খা। তুই অঙ্ক কষ্। তুই পড়্। কলমটা তুই দে। তুই এখানে আয়। তুই বাড়ীতে যা।

উপরের বাক্যগুলিতে ক্রিয়াপদ কি? চল্, খা, কষ্, পড়, দে, আস্, যা।

ক্রিয়াপদের এই রূপের সঙ্গেই "ইব, ইল, ই, ইতেছ, ইয়াছ" প্রভৃতি যোগ করে ক্রিয়ার কাল তৈরি করে থাকি ঃ

আমি যাইব (-যাব) ; সে আসিল (-এল) ; তিনি আসিতেছেন (আসছেন)। সাধুভাষা থেকে চলতি ভাষার ক্রিয়াতে এই বিভক্তির যে-পরিবর্তন ঘটেছে বন্ধনীর মধ্যে তা দেখানো হয়েছে।

চল্, খা, পড়্—এইসব রূপকে ক্রিয়ার মূল বলে।

১। ৩৩, ৩৪, ৩৫ নম্বর পাঠে যে-সব বাক্য ব্যবহার করা হয়েছে তার শেষের ঘটনার আগের ঘটনাগুলি কি ?

২। আগের ঘটনাগুলি যে ক্রিয়াপদে বোঝানো হয়েছে সেগুলি সাধুভাষায় রূপ দাও।

৩। ক্রিয়ার সেই মূলগুলির সঙ্গে কোন্ কোন্ শব্দাংশ জোড়া হয়েছে ?

এই '-ইয়া', '-ইলে' শব্দাংশগুলির নাম প্রত্যয়। এই প্রত্যয় যে-ক্রিয়াপদে বসে তাকে অসমাপিকা ক্রিয়া বলে। অসমাপিকা ক্রিয়া আগের ঘটনার ক্রিয়াপদে ঘটে থাকে।

নীচের 'ক্রিয়া'গুলি সাধুভাষার রূপে লেখ ; তারপর ঐ ক্রিয়ার মূল কি হবে লেখ ; তারপর প্রত্যয় যোগ করে দেখাও। **একটা নমুনা ঃ** চলে←→চলিয়া ; চল্ + এ←→চল্ + ইয়া।

কেটে ; বসে ; দৌড়ে ; হেঁটে ; দেখে ; দিয়ে ; শুনে, কেঁদে ; হেসে ; গিয়ে, থেকে।

('যা'-ক্রিয়া মূলের সময় সময় 'গ' হয় ; আছ এবং থাক্ এমনি একের স্থান আরেকজন নিয়ে থাকে।)

॥ ৩৭ ॥

উচ্চারণ স্থান ও সন্ধিপ্রকরণ

শ্বাস গ্রহণ করাকে বলে প্রশ্বাস ; শ্বাস ত্যাগ করাকে বলে নিঃশ্বাস।

নিঃশ্বাসের সময়েই আমরা শব্দ উচ্চারণ করতে পারি।

নিঃশ্বাসের বায়ুকে যদি মুখগহ্বর দিয়ে বের করতে পারি তবেই শব্দ উচ্চারণ করতে পারব। উচ্চারিত সেই শব্দকেই ধ্বনি বলা হয়।

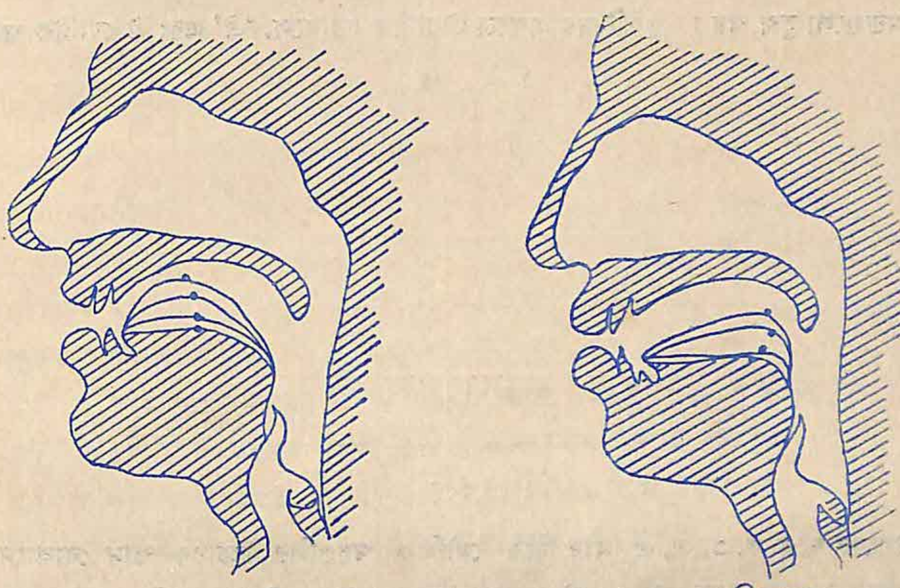
বায়ু বেরোনোর সময় মুখের প্রথম পথ কণ্ঠ ; তারপর তালু ; তারপর মূর্ধা, তারপর দন্ত, তারপর ওষ্ঠ।

ধ্বনি সৃষ্টি করবার সময় জিহ্বা চলা-ফেরা করে। দুইভাবে জিহ্বা চলে ;

(১) কণ্ঠ, তালু, মূর্ধা, দন্ত প্রভৃতিতে খুব অল্প সময়ের জন্য স্পর্শ করে।

(২) কোথাও স্পর্শ করে না, কিন্তু সামনে (দাঁতের দিকে)-পিছনে (কণ্ঠের দিকে) চলে আবার উপরে (তালুর দিকে)-নীচে (তালুর বিপরীত দিকে) চলে।

দ্বিতীয় প্রকারেই স্বরবর্ণ উচ্চারণ করা যায় ; প্রথম প্রকারে ব্যঞ্জনবর্ণ।



সামনে পিছনে

প্রশ্নের উত্তর লেখ ঃ

১। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের কোন্ সময় ধ্বনি উচ্চারিত হয় ?

২। ধ্বনি উচ্চারণে জিহ্বা কয় প্রকারে মুখের ভিতর কাজ করে ?

৩। বায়ু নির্গমনের সময় মুখের প্রথম পথ কি ?

৪। জিহ্বা সম্মুখে আসতে গেলে কোন্‌দিকে আসবে ? পশ্চাতের দিক কোন্‌টি ?

৫। জিহ্বা মুখের উচ্চস্থানে ওঠে বললে কোন্‌দিকে উঠবে ?

৬। তালু এবং দন্তের মাঝখানকার স্থানের নাম কি ?

॥ ৩৮ ॥

১। স্বরবর্ণগুলি লেখ।

২। আগে 'দীর্ঘ' শব্দ জুড়ে কোন্ কোন্ বর্ণের নাম করেছ ?

৩। নীচে যোগ চিহ্ন দিয়ে দুই জোড়া স্বরবর্ণ আছে ; ঐ জোড়ার বর্ণ দুটি একসঙ্গে উচ্চারণ করে বল স্বরবর্ণের কোন্ কোন্ বর্ণের সঙ্গে এক হয় ঃ

অ + ই = ; অ + উ =

যে-ধ্বনি উচ্চারণের সময় একটু বেশি সময় নিয়ে বায়ু বের করা হয়, তাদের দীর্ঘস্বর বলা হয় :

আ, ঈ, ঊ

অন্যগুলো হ্রস্ব স্বর। দুইটি স্বর একত্রে উচ্চারিত হয় বলে, 'ঐ' এবং ঔ-যৌগিক স্বর।

॥ ৩৯ ॥

	সম্মুখ	পশ্চাৎ	
উচ্চ→	ই, ঈ	উ, ঊ	←উচ্চ
মধ্য→	এ	ও	←মধ্য
নিম্ন	×	অ	←নিম্ন

আ (কেন্দ্র)

উপরের ছকে ঋ, ঌ, এ, ঐ বাদ দিয়ে মৌলিক স্বরগুলির উচ্চারণ স্থান বোঝানো হয়েছে। ঌ-কার বাংলায় ভাষার শব্দে নেই ; 'ঋ' আমরা 'রি' এর মতো উচ্চারণ করি—তাই এই ছকে বাদ দেওয়া হল ; ঐ এবং ঔ যৌগিক স্বর বলে বাদ দেওয়া হল।

৩৭ নম্বর পাঠ থেকে জিহ্বার গতি সম্মুখে বা পশ্চাতে, কিংবা উচ্চে বা নিম্নে কোথায় হবে ঠিক করে নাও।

নীচের প্রশ্নের উত্তর কর :

১। সম্মুখভাগের উচ্চস্থানের স্বরবর্ণ কোন্‌গুলি ?

২। পশ্চাৎ-ভাগের নিম্নস্থানের স্বরবর্ণ কোন্‌টি ?

৩। জিহ্বা সামনে যাবে না, পিছনে যাবে না, উঁচুতে উঠবে না, নীচে নামবে না এমন স্থানকে কেন্দ্র বলা হয় : কেন্দ্রের স্বর কোন্‌টি ?

৪। কোন্ কোন্ বর্ণ দীর্ঘস্বর ?

॥ ৪০ ॥

ধরা যাক 'অ'-এর দীর্ঘস্বর 'আ'। ই-এর দীর্ঘ ঈ ; 'উ' এর দীর্ঘ 'ঊ' (উচ্চারণেই বোঝা যায়)।

দীর্ঘস্বরে আমাদের ধ্বনিতে টান বেশি থাকে। প্রায় একই স্থানে জিহ্বা (১) অল্প আর বেশি টান (২) কিংবা অল্পটান আর অল্পটান একসঙ্গে করতে পারে না ; তাই তাকে দীর্ঘস্বরই উচ্চারণ

করতে হয়। এইরকম দুটি স্বরবর্ণ একসঙ্গে উচ্চারণ করতে হলে কিংবা একই স্থানের দুটি হ্রস্বস্বরের উচ্চারণ করতে হলে হয় ঐ দুটি স্বরবর্ণের পরিবর্তন ঘটবে, না হয় দীর্ঘস্বর উচ্চারণ করতে হবে :

একই উচ্চারণ স্থানের হ্রস্ব-দীর্ঘস্বর কত প্রকারে কাছাকাছি আসতে পারে নীচে দেখ (কেন্দ্র স্বরকে অ-এর উচ্চারণ স্থানের মতো এখানে ধরা হয়েছে)।

১		২		৩	
অ + অ	= আ	ই + ই	= ঈ	উ + উ	= ঊ
অ + আ		ই + ঈ		উ + ঊ	
আ + অ		ঈ + ই		ঊ + উ	
আ + আ		ঈ + ঈ		ঊ + ঊ	

সূত্র ধরে বললে :

১। অ-কার বা আ-কারের পর অ বা আ থাকলে উভয় মিলে আ-কার হয়।

২। ই-কার বা ঈ-কারের পর ই বা ঈ থাকলে উভয় মিলে ঈ-কার হয়।

৩। উ-কার বা ঊ-কারের পর উ বা ঊ থাকলে উভয় মিলে ঊ-কার হয়।

কখনও অ-কার, আ-কার কখনও অ, আ বলা হচ্ছে কেন ?

স্বরবর্ণ আর ব্যঞ্জনবর্ণ উভয়ে মিলে শব্দ হয় ; শব্দ যখন বাক্যে বিভক্তি যুক্ত হয়ে, বা বিভক্তি না নিয়ে অর্থ বোঝায়, তখন তাকে পদ বলে।

পদের শেষে স্বরবর্ণ ব্যঞ্জনবর্ণে যুক্ত থাকে ; ব্যঞ্জনবর্ণে যুক্ত হলে স্বরবর্ণগুলি অ-কার, আ-কার, ই-কার, ঈ-কার, উ-কার, ঊ-কার হয়ে যায়। পদের প্রথমে স্বরবর্ণ স্বাধীন ভাবেও বসতে পারে ; তাই তাদের সঙ্গে '—কার' বলতে হয় না।

সূত্র থেকে বোঝা গেল, দুইটি পদ থাকবে ; তার প্রথমটির শেষের স্বরবর্ণ আর দ্বিতীয়টির প্রথমের স্বরবর্ণ পাশাপাশি এসে স্বরবর্ণ দুটির পরিবর্তন ঘটায়।

দুটি স্বরবর্ণের এই রকম পরিবর্তনকেই বলা হয় **স্বরসন্ধি**।

তিনটি সূত্রের একটি করে দৃষ্টান্ত দেখ : (১) দেব + আলয় = দেবালয়।
(২) পরি + ঈক্ষা = পরীক্ষা।
(৩) লঘু + ঊর্মি = লঘূর্মি।

তিনটি শব্দের বর্ণবিশ্লেষণ করলে নিয়ম বোঝা যায় :

(১) দ্ + এ + ব্ + অ + আ + ল্ + অ + য় = দ্ + এ + ব্ + আ + ল্ + অ + য়

(২) প্ + অ + র্ + ই + ঈ + ক্ + ষ্ + আ = প্ + র্ + ঈ + ক্ + ষ্ + আ

(৩) ল্ + অ + ঘ্ + উ + ঊ + র্ + ম্ + ই = ল্ + অ + ঘ্ + ঊ + র + ম + ই

॥ ৪১ ॥

পশ্চাৎ-দিকের নিম্ন বা কেন্দ্র স্বর **উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে সম্মুখের** উচ্চ স্বর উচ্চারণ করতে জিহ্বার গতিতে বাধা আসে ; সে তখন **সম্মুখের মধ্য স্বরটি** উচ্চারণ করতে বাধ্য হয়। কারণ দ্বিতীয় পদের প্রথমের স্বরটি উচ্চারণ করবার জন্য তাকে আগে থাকতেই তৈরি হতে হয়।

৩৯ নম্বর পাঠের ছক থেকে দেখ কি ঘটছে :

অ, আ + ই, ঈ = এ

পশ্চাতের নিম্ন, কেন্দ্র + সম্মুখের উচ্চ   সম্মুখের মধ্য

সূত্র হবে :

৪। অ-কার বা আ-কারের পর ই বা ঈ থাকলে উভয়ের পরিবর্তনে এ-কার হয়। নীচের দৃষ্টান্তগুলির এই নিয়মে সন্ধি কর ; বর্ণ বিশ্লেষণ করে কোথায় পরিবর্তন হয়েছে বুঝিয়ে দাও।

যথা + ইষ্ট ;   পরম + ঈশ্বর ;   দেব + ইন্দ্র।

পশ্চাতের নিম্ন এবং কেন্দ্র স্বরের সঙ্গে পশ্চাতের **উচ্চস্বর** উচ্চারণ করতেও জিহ্বার বাধা আসে ; এবার তাই **পশ্চাতের মধ্যস্বর** উচ্চারণ করে (৩৯ নম্বর পাঠ দেখ) :

অ, আ + উ, ঊ = ও

সূত্র হবে :

৫। অ-কার বা আ-কারের পর উ বা ঊ থাকলে উভয়ের পরিবর্তনে ও-কার হয়। নীচে যে দৃষ্টান্ত দেওয়া হল, তাদের এই নিয়মে সন্ধি কর ; বর্ণবিশ্লেষণ করে কোথায় পরিবর্তন হয়েছে বুঝিয়ে দাও :

মহা + উৎসব ;   হিত + উপদেশ।

॥ ৪২ ॥

সম্মুখের উচ্চ স্বর উচ্চারণ করবার পর পশ্চাতের নিম্ন বা কেন্দ্র স্বর উচ্চারণ করতে জিহ্বার কোন অসুবিধা হয় না ; কেবল একটু দ্রুত উচ্চারণ করতে হয়। এই দ্রুত উচ্চারণ বোঝাতে 'য'-এর ব্যবহার করি ; কারণ অন্তঃস্থ 'য'এর সংস্কৃত উচ্চারণ ইঅ ; আ পরে থাকলে 'ইআ' হয় তাই 'যা' লিখতে হয়।

ই, ঈ + অ, আ = য, যা (ই অ) (ই আ)

সূত্র হবে :

৬। ই-কার বা উ-কারের পর অ বা আ থাকলে উভয়ে মিলে য হয়। অন্তঃস্থ য পরবর্ণে যুক্ত হয়।

দৃষ্টান্তগুলির এই নিয়মে সন্ধি কর এবং বর্ণবিশ্লষণ করে বুঝিয়ে দাও :

অতি + অন্ত ; নদী + অম্বু ; দেবী + আগতা।

পশ্চাতের উচ্চস্বর আর পশ্চাতের নিম্ন এবং কেন্দ্র স্বর এমনি মিলে যায়, অর্থাৎ উঅ বা উআ হবে। কিন্তু বানানে এই 'উঅ' এবং 'উআ' লিখতে হলে অন্তঃস্থ ব-ফলা দিতে হয় ; কারণ অন্তঃস্থ ব-এর উচ্চারণ সংস্কৃতে উঅ।

৭। সূত্র : উ-কার বা উ-কারের পর অ বা আ থাকলে উভয়ে মিলে অন্তঃস্থ ব হয়। অন্তঃস্থ 'ব' পরবর্ণে যুক্ত হয়।

উ, উ, + অ, আ = ব, বা (উ অ বা উ আ)

নীচের দৃষ্টান্তগুলি এই নিয়মে সন্ধি কর ; বর্ণবিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে দাও।

সু + আগতম্ ; বধূ + আদি ; পশু + অধম।

উপরের শ্রেণীতে স্বরসন্ধির আরও কয়েকটা পড়বে।

নীচের লেখায় যে-সব পদের সন্ধি করা উচিত তাদের সন্ধিযুক্ত করে পুনরায় লেখ।

॥ দেব-আলয়ে গিয়ে দেখি জন-অরণ্য। সবাই অতি-অন্ত মোহিত। কাষ্ঠ-আসনে সন্ন্যাসী মহারাজ উপবিষ্ট। কারও মুখে রা নেই। কত সন্ন্যাসী সেখানে! লোকে বলে, অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট। কিন্তু এখানে কিছুই নষ্ট হয় নি। আশা-অতিরিক্ত শ্রবণ প্রতি-আশায় উদ্গ্রীব। মহারাজের ভাষণ যেন দৈব-আদেশ। তাঁর কথায় ভাব-আবেগ নেই। পূজা-উপচার নিয়ে কেউ এল, কিন্তু সবার-ই লক্ষ্যের বাইরে। সকলের চোখ যেন পাথরের। সন্ধ্যা-আলোক যেন সূর্য-উত্তাপ নিয়ে সেই পাথর থেকে রত্ন-উদ্ধার করতে বসল।

সুধী-ইন্দ্রনাথ আমাকে বললেন, 'তুই অরণ্যে পাথর পেলি, তাতে আবার রত্ন!'

আমি বললাম, এটা তো অরণ্যের পাথর নয়। নয়ন-আলোকে নয়নমণি রত্ন হয়ে গেল ॥

॥ ৪৩ ॥

[ব্যঞ্জনসন্ধি]

৩৭ নম্বর পাঠে জিহ্বার স্পর্শ সম্পর্কে ১ নম্বরে যা বলা হয়েছে,

কণ্ঠ, তালু, মূর্ধা, দন্ত প্রভৃতিতে খুব অল্প সময়ের জন্য স্পর্শ করে। কিন্তু জিহ্বার সঙ্গে ওষ্ঠেরও কাজ আছে, সেটি যে-ব্যঞ্জনবর্ণ উচ্চারণ করতে বিশেষ লক্ষ্য করা হয় তাদের বলে ওষ্ঠ্য ব্যঞ্জনবর্ণ। (জাত' অর্থে 'য'-ফলা হয়।)

ক থেকে ম পর্যন্ত সবগুলোকে স্পর্শ বর্ণ বলে। ক থেকে ঙ পর্যন্ত পাঁচটি বর্ণ, একই স্থান

থেকে সাধারণত উচ্চারণ করা হয় বলে এদের বর্গ'-ও বলা হয় ; যেমন ক-বর্গ। এই রকম পাঁচটি বর্গ আছে। মোট পঁচিশটি স্পর্শ বর্ণ।

শ, ষ, স, হ—উচ্চারণ করতে মুখবিবরের বায়ুর শিশ্‌ধ্বনি শোনা যায়, এইজন্য এদের উষ্মবর্ণ বলে।

স্পর্শবর্ণ আর উষ্মবর্ণের মাঝখানে উচ্চারণের আর-এক ধরণ আছে। স্পর্শ আর উষ্মবর্ণের মাঝখানে বলে য, র, ল, ব-কে অন্তঃস্থ বর্ণ বলে।

১। বায়ুনির্গমনের প্রথম পথ 'কণ্ঠ'-কে ধরে স্পর্শবর্ণের বর্গ বিভাগ কর।

২। কণ্ঠ স্থানে উচ্চারণ করা হয় বলে ক-বর্গকে কণ্ঠ্যবর্ণ বলে ; এইরকম ভাবে অন্যগুলির উচ্চারণ স্থান অনুযায়ী নাম লেখ।

৩। অন্তঃস্থ বর্ণ কোন্‌গুলিকে বলা হয় ?

৪। উষ্মবর্ণ কোন্‌গুলি ?

৫। ওষ্ঠবর্ণ কোন্‌গুলি ?

॥ ৪৪ ॥

প্রত্যেক বর্গের দ্বিতীয় এবং চতুর্থ বর্ণগুলি লেখ।

বর্গের প্রথম এবং তৃতীয় বর্ণের সঙ্গে 'হ্‌' যোগ করে উচ্চারণ করলেই দ্বিতীয় এবং চতুর্থ বর্ণ পাওয়া যায়ঃ যেমন চ্‌ + হ্‌ + অ = ছ, জ্‌ + হ্‌ + অ = ঝ।

'হ'-কে মহাপ্রাণ বর্ণ বলেঃ কারণ যতক্ষণ শ্বাস থাকে ততক্ষণ এই উচ্চারণ বাড়িয়ে চলা যায়।

হ্‌ ধ্বনি যার সঙ্গে যুক্ত থাকে তাকেও মহাপ্রাণ বর্ণ বলে ; বর্গের দ্বিতীয় এবং চতুর্থ বর্ণও মহাপ্রাণ বর্ণ। যেগুলি মহাপ্রাণ নয় সেগুলি অল্পপ্রাণ বর্ণ।

নীচের ছকে অল্পপ্রাণ এবং মহাপ্রাণ বর্ণগুলি লেখঃ

বর্গ	অল্পপ্রাণ	মহাপ্রাণ

বর্গের পঞ্চম বর্ণগুলি উচ্চারণ করতে নাসিকাপথেরও সাহায্য নিতে হয়ঃ তাই এগুলি অনুনাসিক বর্ণ। ং এবং ঁ স্বরবর্ণের সঙ্গে যুক্ত থাকে বলে এগুলোকে স্বরবর্ণের নাসিক্য বলে ; কিন্তু বর্গের পঞ্চম বর্ণগুলি ব্যঞ্জন বা বর্গীয় নাসিক্য।

ব্যঞ্জনের কতগুলি বর্ণ আছে, যাদের উচ্চারণে বেশ জোর পড়ে ; কতগুলিতে বেশি জোর পড়ে না। জোর দিয়ে যেগুলি উচ্চারণ করা হয় সেগুলি ঘোষবর্ণ। বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ পঞ্চমবর্ণ এবং হ-কে ঘোষবর্ণ বলে। বর্গের প্রথম, দ্বিতীয় এবং উষ্মবর্ণগুলি অঘোষ। অন্তঃস্থবর্ণগুলি সাধারণত ঘোষবর্ণ।

নীচের ছকে অঘোষ এবং ঘোষবর্ণগুলি লেখ :

অঘোষ	ঘোষ

১। দন্ত্য বর্ণের ঘোষ নাসিক্য বর্ণ কোন্‌টি ?

২। তালব্য বর্ণের অঘোষ মহাপ্রাণ বর্ণ কোন্‌টি ?

৩। 'হ'-এর পরিচয় কি ?

॥ ৪৫ ॥

ব্যঞ্জনবর্ণ পড়ে দেখা গেছে—

(ক) প্রত্যেক বর্গের নাসিক্যবর্ণ পৃথক। ঙ, ঞ, ণ, ন, ম।

(খ) উষ্মবর্ণের তিনটি পৃথক পৃথক নামের ; কারণ পৃথক স্থান থেকে উচ্চারণ। এই উচ্চারণ স্থানের সঙ্গে বর্গের তিনটি উচ্চারণ স্থান মিলে যায় : তালব্য 'শ', এবং তালব্যবর্ণ—চ বর্গ ; মূর্ধন্য ষ এবং মূর্ধন্যবর্ণ, ট-বর্গ ; দন্ত্য স এবং দন্ত্যবর্ণ, ত-বর্গ।

এই দুটি উচ্চারণ স্থানের নিয়মে আমরা বুঝতে পারি, (১) ক বর্গের সঙ্গে নাসিক্যবর্ণ আগে যুক্ত করতে চাইলে 'ঙ' যুক্ত হবে। এবং (২) 'ক-বর্গ এবং প-বর্গ বাদ দিলে' চ-বর্গের পূর্বে উষ্মবর্ণ 'শ', ট-বর্গের পূর্বে উষ্মবর্ণ 'ষ' এবং ত বর্গের উষ্মবর্ণ যুক্ত করতে হলে 'স' যুক্ত হবে।

নীচের প্রশ্নের উত্তর কর :

উষ্ম বর্ণযুক্ত ঠ ; নাসিক্য বর্ণযুক্ত ধ ; উষ্ম বর্ণযুক্ত ছ ; নাসিক্য বর্ণযুক্ত গ।

॥ ৪৬ ॥

দুটি পদ যখন দ্রুত উচ্চারণ করা হয় তখনই সন্ধি ঘটে যায়। ব্যঞ্জন সন্ধিতেও দুটি পদ থাকা চাই ; পূর্বপদ এবং উত্তরপদ।

পূর্বপদের শেষ বর্ণটি ব্যঞ্জন এবং উত্তরপদের প্রথমবর্ণ স্বরবর্ণ কিংবা ব্যঞ্জনবর্ণ হতে পারে। ঐ দুটির যে সন্ধি হয় তাকেও ব্যঞ্জনসন্ধি বলে।

এই সন্ধি করতে উত্তরপদের প্রথম বর্ণটি বিশেষ করে লক্ষ্য রাখতে হয়।

দিক্ + গজ = দিগ্‌গজ।

পূর্বপদের শেষবর্ণ ক ; অল্পপ্রাণ, অঘোষ। উত্তরপদের প্রথমবর্ণ 'গ'—অল্পপ্রাণ, ঘোষ। 'ক'এর পর 'গ' জোর দিয়ে উচ্চারণ করতে হবে ; সেইজন্য 'ক'-এ আগে থেকেই জোর পড়ে, আর তাই সন্ধিতে 'ক'-ঘোষবর্ণ হয়ে বর্গের 'গ' বর্ণ হয়ে গেল।

পরে স্বরবর্ণ থাকলেও এমনি অঘোষবর্ণ ঘোষবর্ণে পরিণত হয় ঃ

বাক্ + ঈশ = বাগীশ।

১। এই নিয়মের সূত্র তাই ঃ পরে স্বরবর্ণ কিংবা ঘোষবর্ণ থাকলে পূর্বের অঘোষবর্ণ নিজ বর্গের ঘোষবর্ণে পরিণত হবে।

নীচের পদগুলি সন্ধিযুক্ত কর ; উচ্চারণ স্থানের (পূর্ববর্ণ এবং পরবর্ণ) পরিচয় দাও ; সূত্র লেখ ঃ

দিক্ + অন্ত ; মৃৎ + ভাণ্ড ; উৎ + যম ; জগৎ + বন্ধু।

নাসিক্য বর্ণ গুলি ঘোষ বর্ণ ; কাজেই পরে নাসিক্য বর্ণ থাকলে পূর্বের অঘোষ বর্ণ ঘোষ বর্ণ হয়ে যাবে। কিন্তু এর আর-একটি প্রয়োগও আছে ; অর্থাৎ সেই বর্গের নাসিক্য বর্ণ-ও হতে পারে।

দিক্ + নির্ণয় = দিগ্‌নির্ণয় এবং দিঙ্‌নির্ণয়।

কিন্তু পরে 'ময়' বা 'মাত্র' থাকলে শুধু নাসিক্য বর্ণ হবে

বাক্ + ময় = বাঙ্‌ময় (বাগ্‌ময় হবে না)।

॥ ৪৭ ॥

প্রথমে ঘোষ বর্ণ এবং পরে অঘোষ বর্ণ থাকলে প্রথমটি সেই বর্গের অঘোষ বর্ণ হবে।

তদ্ + কাল = তৎকাল ; ক্ষুধ্ + পিপাসা = ক্ষুৎপিপাসা

এখানেও শেষ বর্ণটিই প্রথম বর্ণকে বদলে দিয়েছে ; কারণ পরের বর্ণটি মৃদু উচ্চারণ করতে হলে পূর্বেরটিতে জোর দেওয়া অসুবিধা।

২। সূত্র হবে ঃ বর্গের প্রথম বা দ্বিতীয় বর্ণ কিংবা স পরে থাকলে বর্গের তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ণের স্থলে প্রথম বর্ণ হবে।

॥ ৪৮ ॥

আগের বর্ণ ত্ কিংবা দ্, এবং পরের বর্ণ চ-বর্গ বা ট-বর্গ। কেমনভাবে সন্ধি ঘটবে? চ-বর্গ এবং ট-বর্গ উভয়েই ত-বর্গের পূর্বেকার উচ্চারণ স্থানে (তালব্য এবং মূর্ধন্য); কাজেই ত-বর্গের উচ্চারণ স্থান পরবর্তী বর্ণের উচ্চারণ স্থানে যাবে :

উৎ + ছেদ = উচ্ছেদ ; উৎ + ডীন = উড্ডীন।

অঘোষ এবং ঘোষবর্ণ অনুসারে চ, এবং ড হয়েছে ; মহাপ্রাণ অনুযায়ী হয়নি ;

বৃহৎ + ঢক্কা = বৃহড্ ঢক্কা।

ত বর্গের পরে উষ্মবর্ণ থাকলে উচ্চারণ উষ্ম বর্ণের স্থান অনুযায়ী সেই বর্গের রূপ নেবে :

উৎ + শৃঙ্খল = উচ্ছৃঙ্খল।

উষ্মবর্ণে অনেকটা মহাপ্রাণের রূপ আছে ; তাই 'শ'টি 'ছ' হয়ে গেল এবং 'ত'টি আগের নিয়মে 'চ' হয়ে গেছে :

সূত্র :

৩। ত এবং দ এর পর চ, ছ থাকলে ত এবং দএর স্থানে চ হয়
... ... জ, ঝ ... ... জ হয়
... ... ট, ঠ ... ... ট হয়
... .. ড, ঢ ... ... ড হয়

৪। পদের অন্তস্থিত ত এবং দএর পর শ থাকলে ত এবং দ স্থানে চ হয়, আর শ স্থানে ছ হয়।

৫। কিন্তু ত এবং দ-এর পর হ থাকলে ত স্থানে দ এবং হ স্থানে ধ হবে :

উৎ + হত = উদ্ধত।

নীচের পদগুলি সন্ধিযুক্ত কর, পূর্ববর্ণ এবং পরবর্ণের উচ্চারণ স্থান লেখ :

বিপদ্ + জাল ; তদ্ + ছবি ; তদ্ + হিত ; মহৎ + শকট।

॥ ৪৯ ॥

৬। ম্ যদি আগে থাকে এবং পরে যদি স্পর্শবর্ণ থাকে তবে স্পর্শবর্ণটি যে বর্গের সেই বর্গেরই নাসিক্য বর্ণটি 'ম্' এর স্থানে বসে :

সম্ + কলন = সঙ্কলন ; কিম্ + চিৎ = কিঞ্চিৎ ; সম্ + ন্যাসী = সন্ন্যাসী।

অনেক সময় এই নাসিক্য বর্ণের স্থানে 'ং' হয়, কিন্তু সবক্ষেত্রে হবে না।

ং হতে পারে	ং হবে না
সম্ + গীত = সঙ্গীত, সংগীত।	সম্ + চয় = সঞ্চয়।
সম্ + ঘাত = সঙ্ঘাত, সংঘাত।	সম্ + ন্যাসী = সন্ন্যাসী।
বরম্ + চ = বরঞ্চ, বরংচ।	সম্ + মান = সম্মান।

৭। ম্ এবং ন্ এর পর অন্তঃস্থ কিংবা উষ্মবর্ণ থাকলে ম্ বা ন্ এর স্থানে অনুস্বারই হবে :

সম্ + যোগ = সংযোগ ; সর্বম্ + সহা = সর্বংসহা

বাংলা ভাষায় ন্-এর পর উষ্মবর্ণ থাকে এমন শব্দ খুব একটা পাওয়া যায় না ; তবে সংস্কৃত থেকে কিছু পাওয়া যায় :

দন্শ্ = দংশ ; জিঘান্স্ = জিঘাংস ; শন্স্ = শংস।

৮। স্বরবর্ণের পর যদি ছ আসে তবে ছ-এর বদলে চ্ছ হয়ে যায় :

পরি + ছেদ = পরিচ্ছেদ ; বৃক্ষ + ছায়া = বৃক্ষচ্ছায়া।

নীচের প্রশ্নের উত্তর লেখ :

৪৯ নম্বর পাঠের ৬ এবং ৭ নম্বর সূত্রে যে-সব দৃষ্টান্ত দেওয়া আছে তার মধ্যে নীচের শব্দগুলির যে-যে বর্ণের সন্ধি হয়েছে তার উচ্চারণ স্থানের পরিচয় দাও ; সন্ধি ঘটে যাওয়ার পর যে নতুন বর্ণ (ং-কে বাদ দিয়ে) এসেছে তার উচ্চারণ স্থান কি ?

সম্ + চয় ; সম্ + মান ; সম্ + গীত।

অন্তঃস্থ এবং উষ্মবর্ণ থাকলে ং (অনুস্বার) হয় কেন, উচ্চারণ করে তার কারণ অনুসন্ধান কর।

॥ ৫০ ॥

নীচের অংশটি পড়। যে-যে পদে সন্ধি করা দরকার সেগুলির সন্ধি করে পুনরায় রচনাটি লেখ :

॥ বৃক্ষের ছায়ায় বসে আছি। বৃক্ষটিতে কয়েক প্রকারের লতা সম্‌লগ্ন। সর্বম্ সহা এই বসুম্‌ধরা ; কিন্তু গাছটিও কম সইছে না।

ষট্‌ঋতুর শেষ ঋতুটিই এখন ; বছরের শেষ পরি-ছেদ। প্রকৃতি ফুল ফুটিয়ে যেন বাক্‌ময়ী হয়েছেন। জগৎনাথের চিৎময় রূপের কথা ভাবতে ভাবতে কিম্‌চিৎ তন্দ্রায় অভিভূত হয়েছিলাম।

ঘুমের ঘোরেই শুনছিলাম অসীম দিক্‌অন্তে কি যেন ধেয়ে ধেয়ে চলেছে। চোখ মেলে দেখি কুৎঝটিকার একটি রেখা। না, তা তো নয়! ঐ রেখাটি যেন চলার পথের উৎশ্বাস। সাঁতরাতে গিয়ে যেমন হাতে-পায়ে জলের ফেনা গড়ে তোলে।

এরোপ্লেন নয়। এরোপ্লেনের সামনে প্রপেলার বা চালক-পাখা থাকে। এর তা নেই। অথচ কিমৃভূতও নয়।

তাহলে এটি জেটপ্লেন। জেটপ্লেন অনেক বেশি দ্রুত যায়, অনেক বেশি উঁচুতে উঠতে পারে।

প্রায় দুই হাজার বছর আগে আলেকজান্দ্রিয়াতে বাস করতেন হেরো। তিনি এই রকম এক জেট যন্ত্র তৈরি করেছিলেন। জিওভান্নি ব্রাঙ্কা ইতালীতে থাকতেন; প্রায় সাড়ে তিন শত বৎসর পূর্বে তিনিও এই ধরণের এক যন্ত্র তৈরি করেন। আইজাক নিউটন বৈজ্ঞানিক ছিলেন; তাঁর বিজ্ঞানসূত্র থেকে জেটের নিয়ম পাওয়া গেছে।

পরে ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে জার্মানীর লোকে এই জেট বিমান প্রথম নির্মাণ করেন॥

নীচের প্রশ্নের উত্তর কর:

১। 'বৃক্ষের ছায়ায়' না বলে সন্ধিযুক্ত পদ কি ব্যবহার করা যায়?

২। 'তন্দ্রায় অভিভূত, কথাটির বদলে একটি সন্ধিযুক্ত পদ ব্যবহার কর।

৩। 'ঘুমের ঘোরে'-র 'র' বিভক্তি বাদ দিয়ে পদ দুটি যুক্ত করে দেখাও।

৪। 'বিজ্ঞান সূত্র' শব্দ দুইটির প্রথমটিতে 'র' বিভক্তি যোগ করলে কি হবে?

৫। 'শেষ ঋতু' না বলে কোন্ নাম ব্যবহার করা যায়?

॥ ৫১ ॥

[শব্দ-গঠন]

১। 'রক্ষণাবেক্ষণ করেন', 'পালন করেন', 'পরিচালনা করেন', বা 'অধিকারে আছে'—এই রকম অর্থ বোঝাতে আমরা পতি শব্দ যোগ করে থাকি: যেমন,—সভাপতি।

বিশেষ্যের সঙ্গে পতি যুক্ত করে আরও কয়েকটি শব্দ লেখ, এবং প্রত্যেকটি ব্যবহার করে পৃথক পৃথক বাক্য লেখ।

২। 'কোন একটা ক্রিয়া করছে' কিম্বা 'কোন অবস্থায় আছে'—এই অর্থ বোঝাতে '-অন্ত' শব্দ যোগ করা যায়: যেমন 'বেঁচে আছে' অর্থাৎ 'জীবন এখনও আছে' এই কথা বোঝাতে বলে থাকি জীয়ন্ত, বা জীবন্ত। 'চলার অবস্থায় আছে'—চলন্ত।

নীচের শব্দগুলোর এই রকম অর্থে ব্যাখ্যা কর; প্রত্যেকটি দিয়ে পৃথক বাক্য লেখ:

ভাসন্ত; পড়ন্ত; ঘুমন্ত।

৩। 'কোন বিষয়ে খুব ভালো' এইরকম অর্থ বোঝাতে হলে আমরা শব্দের শেষে ইয়ে, সাধু ভাষায় 'ইয়া' যোগ করি। যেমন, যে-খুব গান গায় সে 'গাইয়ে'।

নীচের অর্থের সঙ্গে মিল রেখে উপরের 'ইয়ে' যোগ করে শব্দ তৈরি কর :

যে খুব খেতে পারে ; যে খুব ভালো বাজাতে পারে ; যে খুব চলতে (হাঁটতে) পারে ; যে খুব বলতে পারে ; যে খুব লিখতে পারে।

৪। নীচের শব্দগুলোর অর্থে কি করবার 'ইচ্ছা' বোঝাচ্ছে, (না পারলে অভিধান দেখ) ?

পিপাসা ; জিজ্ঞাসা ; বুভুক্ষা।

৫। কোন স্থানে থাকে এবং খাদ্যের অনুসন্ধানে সেখানেই চলাচল করে—এইরকম অর্থে 'চর' যোগ করা হয় ; আবার কোন ব্যাপার সে একাই করে (বা ঘটায়), অর্থাৎ তার থেকেই সেই ব্যাপারের উৎপত্তি-এই রকম অর্থে 'কর' যুক্ত করা হয়।

এই রকম অর্থে নীচের শব্দগুলির ব্যাখ্যা কর :

খেচর ; জলচর ; বনচর ; নিশাচর ; দিবাকর ; নিশাকর ; প্রভাকর ; পুষ্টিকর।

৬। নীচে বাঁ দিকে কতগুলি মূলশব্দ আছে ; ডানদিকে বিশেষ অর্থ বোঝানোর জন্য মূল শব্দের কিছু কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে ; বর্ণবিশ্লেষণ করে দেখাও মূলশব্দের কি কি বর্ণের পরিবর্তন ঘটেছে ; পরিবর্তিত শব্দ দিয়ে পৃথক পৃথক বাক্য লেখ :

মূলশব্দ	পরিবর্তিত শব্দ	পরিবর্তিত শব্দের অর্থ
নগর	নাগরিক	নগরে যে থাকে।
অরণ্য	আরণ্যক	অরণ্যে যে থাকে।
শরীর	শারীরিক	শরীর সম্পর্কিত।
দন্ত	দন্ত্য	দন্ত স্থানে যা জাত হয়।
সম্প্রতি	সাম্প্রতিক	বর্তমান কালে যা জাত।
সভা	সভ্য	সভার নিয়মকানুন যে মেনে চলে।
সমাজ	সামাজিক	সমাজের নিয়মকানুন যে মেনে চলে
বেদ	বৈদিক	বেদের নিয়ম যে মেনে চলে ; এবং বেদ যে পাঠ করে।
কুম্ভ	কুম্ভকার	মাটির পাত্র যে তৈরি করে।
জাল	জালিক	জালের সাহায্যে যে জীবিকা নির্বাহ করে।
সর্বাঙ্গ	সর্বাঙ্গীণ	সমস্ত অঙ্গ ব্যেপে যা থাকে।
সমুদ্র	সামুদ্রিক	সমুদ্র থেকে জাত।

মূলশব্দ	পরিবর্তিত শব্দ	পরিবর্তিত শব্দের অর্থ
জ্ঞান	জ্ঞানী	জ্ঞান আছে যার।
ধন	ধনী	ধন আছে যার।
সাহস	সাহসী	সাহস আছে যার।

৭। 'দুঃখ আছে যার' বোঝাতে কি শব্দ ব্যবহার করা হয়? 'সুখ আছে যার' এক কথায় কি বলা হয়?

৮। (ক) ৫ নম্বর পাঠ থেকে 'অসূর্যম্পশ্যা' শব্দটির অর্থ লেখ।

(খ) ৯ নম্বর পাঠ থেকে 'গৃহস্থ' শব্দটির অর্থ লেখ।

(গ) ৯ নম্বর পাঠ থেকে 'যাযাবর' শব্দটির অর্থ লেখ।

(ঘ) ৯ নম্বর পাঠ থেকে 'অনুর্বর' শব্দটির অর্থ লেখ।

(ঙ) ২৭ নম্বর পাঠে 'উদ্বাস্তু' কাকে বলা হয়েছে?

॥ ৫২ ॥

হার (হেরে যাওয়া), আহার (খাওয়ার কাজ), প্রহার (মারা), বিহার (বেড়ানো), উপহার (ভালো বলে কিছু দেওয়া)।

উপরের শব্দগুলি পড়। একই শব্দ সামান্য পরিবর্তনে অর্থের কত পরিবর্তন ঘটিয়েছে। শব্দের পরিবর্তন ঘটেছে প্রধান শব্দের আগে আ, প্র, বি, উপ এই সব শব্দাংশ জুড়ে দিয়ে। এই শব্দাংশগুলিকে উপসর্গ বলে।

উপসর্গ মোট কুড়িটি আছে:

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
প্র,	পরা,	অপ,	সম,	নি,	অব,	অনু,	নির্,
৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
দুর্,	বি,	অধি,	সু,	উৎ,	পরি,	প্রতি,	অভি,
		১৭,	১৮,	১৯	২০		
		অতি,	অপি,	উপ,	আ		

এইগুলি ক্রিয়ার বিভিন্ন রূপের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ক্রিয়ার প্রধান অর্থকে বদলে দেয়। নীচে ক্রিয়ার রূপ দেওয়া আছে। প্রত্যেকের সঙ্গে কয়েকটি উপসর্গ যোগ করে তোমার জানা বা শোনা আছে এমন শব্দ গঠন করে তাদের অর্থ লেখ।

চয়; জয়; গম্ বা গমন; কার; ঈক্ষা; বাদ

॥ ৫৩ ॥

ভাষায় কতগুলি পদ পাওয়া যায় যার অর্থ সেই শব্দ দুটি থেকেই পাওয়া যায় না ; কিন্তু অন্য কোন বস্তু বা ব্যক্তিকে সহজেই বোঝা যায়।

পঙ্কে বা কাদায় অনেক কিছুই জন্মাতে পারে, কিন্তু 'পঙ্কজ' বলতে আমরা শুধু পদ্মকেই বুঝিয়ে থাকি।

আকাশে বিমানও ওড়ে, কিন্তু 'খেচর' বলতে পাখীকেই বোঝাই। হলুদ রঙের (পীত) কাপড় (অম্বর) অনেকেই পরতে পারে কিন্তু পীতাম্বর বললে আমরা শ্রীকৃষ্ণকে বুঝে থাকি।

নীচের পদগুলিতে কি কি বোঝাতে পারে, অথচ কোন্‌টিকেই একমাত্র বোঝাবে লেখ :

(ক) হলধর ; দশানন ; দশরথ ; পার্থ ; যুধিষ্ঠির।

নীচের পদে কিরূপ ব্যক্তিকে বা বস্তুকে বোঝায় লেখ ;

(খ) বিধবা ; নির্মল ; উন্মনা ; চক্রপাণি।

নীচের বিবরণে এমন দুটি পদ আছে যাদের যুক্ত করলেই সমগ্র বিবরণ বোঝা যাবে ! সেই পদ যুগল একত্র করে একটি পদ লেখ :

(গ) স্থির বুদ্ধি যার ; পদ্মের মত গন্ধযুক্ত যে বস্তুর ; সু (মহৎ) হৃদয় যার ; ঘৃত মিশ্রিত অন্ন ; ভাতে সিদ্ধ আলু ; চন্দ্র চূড়াতে যার ; শোক রূপ অনল ; ঘন (মেঘ)-এর মতো শ্যাম।

॥ ৫৪ ॥

১। নীচের বাক্যাংশকে (সম্পূর্ণ বাক্যের কয়েকটি পৃথক পদ) এক কথায় লেখ :

(ক) দান করেন যিনি ; (খ) চাষ করেন যিনি ; (গ) কুম্ভ প্রভৃতি মাটির পাত্র তৈরি করেন যিনি ; (ঘ) স্বর্ণের বস্তু তৈরি করেন যিনি ; (ঙ) রত্নের আকর (খনি) ; (চ) বিদ্যা আছে যাঁর ; (ছ) শিক্ষা দেন যিনি ; (জ) যে পদ্ম নীল রঙের ; (ঝ) কমলের ন্যায় চরণ ; (ঞ) বেদ যিনি মানেন।

২। নীচের বাক্যগুলিতে যে-সব যুক্ত পদের ব্যাখ্যা করে লেখা যায় সেগুলি ব্যাখ্যা করে বাক্যগুলি পুনরায় লেখ। 'ট-এ' নমুনা দেখ :

(ট) (১) তিনি সপরিবারে গুপিগাইন-বাঘা বাইন ছবি দেখতে গেলেন।
(২) তিনি তাঁর পরিবারের সঙ্গে গুপি গাইন-বাঘাবাইন ছবি দেখতে গেলেন।

(ঠ) তিনি নিঃসন্তান তাই তাঁর বাড়ীটাতে ইস্কুল তৈরি করলেন।

(ড) আমাদের ক্লাশের যত্ন হেডমাস্টারমশায়ের ভ্রাতৃব্য।

(ঢ) এই পুষ্করিণীর জল বড় পঙ্কিল।

(ণ) রামচন্দ্রকে কৈকেয়ী বনবাসে পাঠালেন।

॥ ৫৫ ॥

॥ তার মা-বাপ নেই। পয়সার মা-বাপ নেই না কি ॥

উপরের দুটি বাক্য পড়ে দেখ, মা বাপ কথাটা দুটি বাক্যেই আছে, কিন্তু অর্থ সম্পূর্ণ পৃথক। প্রথম বাক্যের মা বাপ অর্থ মা ও বাপ (বাবা)। মা-বাবা সন্তানকে রক্ষণাবেক্ষণ করেন, তার জীবনের জন্য, বেঁচে থাকার জন্য সব রকমের সাহায্য করেন ; তার যাতে ক্ষতি না হয়, কেউ যাতে তার ক্ষতি না করতে পারে, মা-বাবা সে দিকে লক্ষ্য রাখেন। এই রকম ভাবেই সন্তানের প্রতি মা-বাপের স্নেহ মমতা ভালোবাসা প্রকাশ পায়।

এই সাধারণ অর্থ দ্বিতীয় বাক্যে বিশেষ অর্থে দাঁড়ায়। পয়সা বুঝে খরচ করা, অযথা পয়সা উড়িয়ে না দেওয়া,—এইসব বিবেচনা করেই মানুষ সাধারণত চলবে ; সেক্ষেত্রে বিচার-বিবেচনা না করে অসঙ্গত-ভাবে ব্যয় করলেই বলা হয় 'পয়সার মা-বাপ নেই নাকি !'

সাধারণ অর্থ থেকেই বিশেষ অর্থ আসছে। বিশেষ অর্থ বুঝতে গেলে সাধারণ অর্থকে ব্যাখ্যা করে দিতে হয়।

নীচের বাক্য দুটি পড়। তারপর, প্রশ্নগুলির উত্তর কর :

(ক) আজ শুধু ডাল-ভাত খেয়ে এলাম। (খ) দুটো ডাল-ভাতের যোগাড় করাই এখন কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ক-বাক্য	খ-বাক্য
১। ডাল-ভাত ছাড়া আর কি কি বাঙালীরা খেয়ে থাকে ?	১। ডাল-ভাত নিতান্তই সামান্য খাবার কেন ?
২। শরীর রক্ষার জন্য কি কি দ্রব্য সাধারণত খাওয়া উচিত ?	২। কোন-রকমে খাবার যোগাড় করা অর্থে 'ডাল-ভাত' ব্যবহার করা হয়েছে কেন ?
৩। 'সুষম খাদ্য' কাকে বলে ?	৩। 'ডাল ভাত' কথায় ডাল আর ভাত-কে বোঝায়নি, তার কারণ কি ?
৪। ভাত খেতে হলে অন্তত ডাল-টার দরকার পড়ে কেন ?	৪। ডাল-ভাতের বদলে আর কোন্ কথা ব্যবহার করা যেতে পারত ? পাশের বাক্যাংশ তিনটি থেকে ঠিক উত্তর বাছাই কর। সামান্য খাদ্য ; যা না খেলে নয় ; পুষ্টিকর।

ক-বাক্যের সাধারণ অর্থ থেকে খ-বাক্যে ডাল-ভাতের বিশেষ অর্থ কি দাঁড়িয়েছে, লেখ।

নীচের প্রশ্নের একই বাক্যাংশ দিয়ে দুটি করে বাক্য রয়েছে ; এই সব বাক্যাংশের সাধারণ অর্থ এবং বিশেষ অর্থ খাতায় লেখ :

১। ডুমুরের ফুল আছে কিন্তু বাইরে দেখা যায় না॥ অবনী আজকাল ডুমুরের ফুল হয়ে গেছে।

২। কলুর বলদ কি কাজ করছে জানে না, কিন্তু অবিরাম ঘুরে যাচ্ছে॥ রামপ্রসাদ বলেছিলেন, 'মা আমায় ঘোরাবি কত, চোখ-ঢাকা কলুর বলদের মতো'।

৩। চিনির বলদ চিনি বয়ে নিয়ে যায়, কিন্তু তা খেতে পায় না॥ এ সংসারে চিনির বলদের মতো খেটে লাভ কি ?

৪। মিনু তাসের ঘর সাজাচ্ছে॥ এত আশা করে সব কিছু করলাম, কিন্তু সব তাসের ঘর হবে তা কি আর জানতাম !

৫। বিদুর দরিদ্র ছিলেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের জন্য তাঁর ক্ষুদই রান্না করে তাঁকে তৃপ্ত করে খাওয়ালেন॥ আমি দরিদ্র হতে পারি কিন্তু আপনি এলে বিদুরের ক্ষুদ দুটি জুটবেই।

৬। কুমারটুলীতে গিয়ে তাঁর বাড়ীর দারোয়ানকে কত কথা জিজ্ঞেস করলাম, কোন কথা নেই ; কত বকলাম-ঝকলাম কিন্তু গোঁফের আড়ালে হাসতে থাকল ; হাত দিয়ে ঠেললাম, ঘুরে গেল ; পরে দেখলাম—'ও মা এ যে মাটির মানুষ'॥ তাঁর মতো লোক আমি দেখি নি, একেবারে মাটির মানুষ।

৭। কুঞ্জবিহারী অন্ধ, একখানা যষ্টি নিয়ে পথ চলে॥ বিক্রমবাবুর বড় ছেলে পার্শ্বনাথই তাঁর অন্ধের যষ্টি।

৮। দণ্ডক অরণ্যে শ্যামলী পথ ভুলে গেল ; তার কি কান্না, কি রোদন ; কিন্তু অরণ্যে কে তার এই রোদন শুনতে পাবে॥ জনমেজয় বাবুর কাছে সে কত আবেদন নিবেদন করল কিন্তু সব অরণ্যে রোদন মাত্র।

॥ ৫৬ ॥

(ক) সুনির্মলবসুর একটি গল্প আছে—'রামলালের মামলা।' সেই গল্পে তিনি লিখছেন, ভালো মানুষ রামলাল তাঁর এক আত্মীয় লম্বোদরের সঙ্গে ট্রেনে যাচ্ছিলেন। দুই জনেই ঘুমিয়ে ছিলেন। কিন্তু লম্বোদর রামলালের আগে মধুপুর নেমে গিয়েছিলেন, রামলাল তখনও ঘুমিয়ে, তাই রামলালকে আর লম্বোদর জাগিয়ে দেন নি। রামলালের ঘুম পরে ভাঙলো। তিনি পাশের লোককে ভাবলেন লম্বোদর। লম্বোদরকে নিয়ে একটু কৌতুক করতে গিয়ে দেখেন, কে এক দারোগা পঞ্চানন সেখানে শুয়ে, কিন্তু লম্বোদর ভেবে অন্ধকারে তারই নাকে নস্যি দিয়ে বিপদে পড়েছেন। সেই গল্পের কয়েকটা কথাবার্তা তুলে দিচ্ছি। ৫৫ নম্বর পাঠের মতো সেই সব কথার মধ্যে যে সব বাক্যাংশ সাধারণ থেকে বিশেষ অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে সেইগুলি বাছাই করে তার বিশেষ অর্থ বুঝিয়ে দাও।

১। লম্বোদর মুচ্‌কি হেসে উত্তর দিল—"না হে, কোন ভয় নাই, তোমার মত কুম্ভকর্ণের ঘুম আমার নয়।"

২। হাঁচির ভাবটা ততক্ষণ অনেকটা কমে এসেছে,—সেই মোটা লোকটা গর্জন করে রামলালের দিকে তেড়ে এল—

"চালাকি পেয়েছ—লোক চেন না? দারোগা পঞ্চাননের সঙ্গে প্রবঞ্চনা, কেউটের গর্তে হাত?"

নেহাৎ অপ্রস্তুত হয়ে রামলাল বললে,—"আজ্ঞে মাপ করবেন, আমি ভেবেছিলাম আমার আত্মীয় লম্বোদর—"

লোকটি আরও খাপ্পা হয়ে বললে—"হুঁ, আর আত্মীয় লম্বোদর হয়ে গেল দারোগা পঞ্চানন, ছিল পাতি হাঁসের ডিম—বেরুলো গোখ্‌রো সাপের বাচ্চা, ইয়ার্কির আর জায়গা পাও নি, ঘুঘু দেখেছ ফাঁদ দেখ নি?"

(খ) হেমেন্দ্রকুমার রায়ের একটি গল্প 'তিন নম্বরের ঘর'। পুরীতে দুই বন্ধু বেড়াতে গিয়েছে, এক বন্ধুর নাম শচীন আর অন্যজনের নাম নেই, সে নিজেই গল্প বলছে; (লেখক নিজে হতেও পারেন, নাও হতে পারেন)। পুরীতে শচীন এই হোটেলে আগের বার এসেছিল, ভালো ঘর পেয়েছিল। এবার ভিড় বেশি, তাই রান্নাঘরের পাশে তাদের ছোট্ট একটা কুঠরী জুটল। আলো-হাওয়া নেই, রান্নার গন্ধ, কয়লার ধোঁয়ায় সেখানে থাকা অসম্ভব। শচীন ফন্দি আঁটলো কি করে ভালো ঘরের খরিদ্দারকে তাড়িয়ে সেটি পাওয়া যায়। সে ভূতের গল্প বলে তিন-নম্বরের ঘরের লোককে তাড়িয়ে দিল।

এই গল্পের কয়েকটি কথাবার্তা তুলে দিচ্ছি। এর মধ্যে যে-সব বাক্যাংশ সাধারণ অর্থ থেকে বিশেষ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলি বাছাই কর; বিশেষ অর্থ কি হবে তা খাতায় লেখ।

৩। বৈকাল হতে না হতেই শচীনের সহ্যশক্তি নিঃশেষে ফুরিয়ে গেল। মাথা নেড়ে বললে, "উঁহু, এ অসম্ভব! আমরা কেউ ইট কি পাথর নই। এখানে থাকলে মারা পড়ব।"

৪। আমি বললুম, "তোমার সাধ চাঁদ ধরবার সাধের মতন। এ সাধ মিটবে না, কারণ সে-ঘর এখন অন্য লোকের দখলে।"

৫। সারা আকাশ মেঘের কাজলে এমন কালো হয়ে গেল যে, তার ছায়ায় সমুদ্রের গায়ে নীল রঙের একটুও চিহ্ন রইল না। চারিদিকে অকাল-সন্ধ্যা নেমে এল, তারপরেই বাজের বাজনা আর বিজলীর রোশনাইয়ের সঙ্গে সঙ্গে ঝম্‌-ঝম্‌ বৃষ্টি সুরু।

৬। সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে কি যেন একটা অজানা ভয় পা টিপে টিপে সেই ঘরের ভিতরে এসে ঢুকে পড়ল।

৭। বাইরে তখন অবিরাম চলেছে বজ্রের হুঙ্কার, সমুদ্রের গর্জন, বৃষ্টিধারার কান্না ও ঝোড়ো হাওয়ার হাহাকার।

৮। সে অন্ধকার কালো অন্ধকার নয়, সে যেন আলোময় অন্ধকার। কারণ ঘরে বাতি

জ্বলছিল না, খোলা জানালা দিয়ে একটুও চাঁদের কিরণ আসছিল না ; তবুও অন্ধকারের ভিতরেই বায়স্কোপের ছবির মতো স্পষ্ট হয়ে উঠল, ঘরের সেই ড্রেসিং টেবিলটা।

৯। তার নাকের তলায় দুর্গা-ঠাকুরের অসুরের মতন মস্তবড় গোঁফ আর তার ভয়ঙ্কর দুটো চোখ যেন জ্বলন্ত ভাঁটার মত !

(গ) কুলদারঞ্জন রায়ের গল্প 'পুণ্যের হিসাব।' বিক্রমাদিত্য কোন্ পুণ্যের দরুণ রাজা হয়েছিলেন, সেই কথা কেউ বলতে পারেনি, পরিশেষে বররুচির ছোট মেয়ে বলতে পেরেছিল। কিন্তু বররুচির মেয়ে যে বলতে পারবে, সে কথা কেউ জানত না। কি করে সেই খোঁজ পাওয়া গেল—সেই কথাই লেখক বলছেন। যমরাজার কাছ থেকে এক ব্রাহ্মণ তা জানতে পেরেছিল। কিন্তু জীবন্ত মানুষ সেই ব্রাহ্মণ কি করে গেল যমরাজার কাছে ? যমরাজাকে যমদূতেরা অনুরোধ করেছিল। যমরাজা তার আগে এক জীয়ন্ত মানুষ কৃষককে এনে বড় বিপদে পড়েছিলেন। কৃষকটি যমরাজাকে ফাঁকি দিয়ে যমরাজার সিংহাসনে বসে যমরাজাকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। সেই কৃষককে কিভাবে কৌশল করে যমরাজা সরিয়ে দিয়েছিলেন সেই কথা যমরাজা বলছেন।

এই গল্পের যমরাজার কয়েকটি কথা তুলে দিচ্ছি। এর মধ্যে যে-সব বাক্যাংশ সাধারণ থেকে বিশেষ অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে, তা লিখে নাও। বিশেষ অর্থ কি হবে খাতায় লিখে উত্তর কর :

১০। সংবাদ শুনে ভয়ে আমার অন্তরাত্মা শুকিয়ে গেল। তখন জানালা দিয়ে গলে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে একদম পিতামহ ব্রহ্মার বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হলাম। হাঁপাতে হাঁপাতে বিপদের কথা সমস্ত জানিয়ে ব্রহ্মার পা জড়িয়ে ধরে বললাম—"দোহাই পিতামহ ঠাকুর ! যমপুরীতে জীয়ন্ত মানুষ এনে মাটি খেয়েছি, এখন এ বিপদ থেকে আমায় উদ্ধার করুন।"

চিঠি লেখা ও রচনা

॥ ৫৭ ॥

২৩।৪ শরৎ বসু রোড
সুভাষ নগর
কলিকাতা-৫
১লা ফেব্রুয়ারী ১৯৭০

প্রিয় কমলাপতি,

বেনারস থেকে তোমাকে ছেড়ে চলে এসেছি একমাস আগে। আসবার দিন তোমাকে চিঠি লিখব বলেছিলাম। কিন্তু সরস্বতী পূজার জন্য বড় ব্যস্ত ছিলাম, তাই সময়মতো চিঠি দেওয়া হয় নি।

বাংলাদেশে সরস্বতী পূজোয় খুব জাঁকজমক হয়। দুর্গাপূজার মতোই বড় রকমের পূজা।

তুমি হয়ত জান, সরস্বতী বিদ্যার দেবতা। কিন্তু আমরা এর মধ্যে আরও আনন্দ পাই। কেউ বলেন. প্রাচীনকালে এই শ্রীপঞ্চমী তিথি থেকেই নববর্ষ সুরু হত। সত্যি কিনা জানি না। তবে শীতের শেষে বসন্তকালের সুরুতে যে এই পূজো তা হয়ত জান।

যাক, এখন থেকে ঠিকমতো চিঠিপত্র লিখতে পারব। কিন্তু তোমার উত্তর না পেলে আমি লিখব না।

তুমি আমার ভালোবাসা নিও। ছোট বোনকে স্নেহ দিও। মা, বাবাকে প্রণাম জানাচ্ছি।

ইতি—

তোমার বন্ধু
সুহাস।

ডাকটিকিট

শ্রীকমলাপতি মিশ্র
শ্রীযুক্ত মথুরানাথ মিশ্রের বাড়ী
৫ নং দশাশ্বমেধ ঘাট
বেনারস (ইউ. পি)

উপরের চিঠি পড়লেই বোঝা যায় সুহাস তার বন্ধু কমলাপতিকে চিঠি লিখছে। উপরে ডানদিকে সুহাসের বাড়ীর ঠিকানা আর তারিখ। তারপর বাঁ দিকে প্রথমে বন্ধুকে সম্বোধন করা হয়েছে।

ভিতরে খবর বা বক্তব্য। তারপর ইতি লিখে সুহাস নিজের পরিচয় ও নাম দিল। পোস্টকার্ডের উল্টো পিঠে কমলাপতির ঠিকানা এমনভাবে লেখা হয়েছে যাতে পোস্ট অফিসের পিওন ঠিকমতো বাড়ী খুঁজে পায়।

চিঠিটার ভিতরের লেখা পড়লেই বোঝা যায়, সুহাস জানে তার বন্ধু কমলাপতি বাংলাদেশের সরস্বতী পুজো সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানে না। তাই অল্পের মধ্যে সরস্বতী পুজো সম্পর্কে জানিয়ে দিল।

কিন্তু সরস্বতীপুজো সম্পর্কে সুহাস আরও বেশি লিখতে পারত। ধরা যাক, সে এমনভাবে লিখল যাতে যে-কেউ পড়তে পারে, পড়ে বুঝতে পারে। যে-কোন লোকের জন্য যদি বড় করে কোন বিষয়ের পরিচয় লেখা হয় তবে সেটিকে বলা হবে প্রবন্ধ।

চিঠির কয়েকটা ভাগ হলঃ চিঠি যে লিখছে তার ঠিকানা আর তারিখ, সম্বোধন, বক্তব্য বিষয়, ইতি এবং যার কাছে লেখা হবে তার নাম ও ঠিকানা।

প্রবন্ধেও এমনি ভাগ আছে। সরস্বতীপুজো সম্পর্কে যদি প্রবন্ধ লিখতে হয়, তবে প্রথমেই বলতে হয়—এই প্রবন্ধ লিখবার কারণ কি, আমার ইচ্ছে হয়েছে কেন ; তারপর সরস্বতীপুজো কি ; পরে সরস্বতী পুজো সম্পর্কে আমার মনোভাব কি হল।

সরস্বতী পুজো সম্পর্কে নীচে ছোট প্রবন্ধ লেখা হল।

॥ শীতের সময় কি হাড় কাঁপুনিই না গেল। মাঘের শীতে বাঘও কাবু। গরীবদের কতই না দুঃখ। গরম জামা কাপড় নেই, ভাল ঘরবাড়ী নেই। শীতকালে শরীর গরম রাখতে হয় নানারকম পুষ্টিকর খাদ্য দিয়ে। কিন্তু সে সব কোথায় তারা পাবে! গাছের পাতা ঝরে যাচ্ছে, সব যেন বুড়ো হয়ে হাঁটুতে মুখ ঢেকে বসে আছে।

এক সময় গাছে গাছে ফুল ফুটতে থাকে ; একটু যেন গরম হাওয়া বইছে! কোকিলের ডাক শোনা যায়। প্রকৃতির জীব পাখী, ঋতু পরিবর্তন তারা মানুষের আগে টের পায়। বুড়ী প্রকৃতি আবার গা ঝাড়া দিয়ে উঠছে। দুঃখের দিন বুঝি ঘুচে গেল। মানুষ আনন্দে উৎসব সুরু করল। এই উৎসবই শ্রীপঞ্চমী তিথিতে হয়। উৎসবের দেবী সরস্বতী। তাই সরস্বতীপুজো বাঙলাদেশের লোকের এত ভালো লাগে।

শুনেছি প্রাচীন শাস্ত্র বেদেও সরস্বতী পুজোর কথা আছে। সে কি ধরণের পুজো ছিল তা খুব বেশি জানা নেই। কিন্তু ঋতুবদলের পুজো সরস্বতী পুজো বলে মনে করলে ভুল হয় না। পণ্ডিতেরা অনেকে তাই বলেন বিগত পুরাতন বৎসরের পর নূতন বৎসরের প্রথম পুজো সরস্বতীর।

ইস্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীদের এই পুজোয় কতই না আনন্দ। যত রকমের সুন্দর বিদ্যা আছে তারই দেবী সরস্বতী। মেঘের রঙ কালো, আগুনের রঙ লাল, কিন্তু রোদ্দুরের রঙ প্রায় সাদা। রোদ্দুরই তো আমাদের জীবন বাঁচায়, রোদ্দুরের জন্যই সৃষ্টি বেঁচে আছে, রোদ্দুরের তাপেই

সাগরের জল মেঘ হয়, কালো হয়। সরস্বতীর রঙ সম্পূর্ণ শুভ্র। শুভ্র বরণা বাগ্দেবী রোদ্দুরের থেকেও সাদা। এই সাদা রঙের আর পরিবর্তন হবে না, মেঘ হবে না, কালো হবে না, লাল হবে না। বাইরের পৃথিবীতে নয়, জ্ঞানে মনের যে পরিবর্তন হয় সেই কথাই এই সাদা রঙে রয়েছে। পৃথিবীর কোন মলিনতার স্পর্শ নেই বলে সরস্বতী দেবী।

বৎসর বৎসর ধরে আমরা সরস্বতীর পূজো করতে যেন পাই, দেবীর কাছে সেই প্রার্থনা করি ॥

॥ ৫৮ ॥

শিখা স্কুলে গেল না। খেলাধূলা ছিল, তাকে পাছে নামতে হয়, সেই ভয়েই গেল না। তারপর দিন প্রধান শিক্ষিকার কাছে চিঠি নিয়ে গেল।

প্রধান শিক্ষিকা,
লেক স্কুল
সাদার্ণ এভেন্যু,
কলিকাতা।

মাননীয়া মহাশয়া,

আমি শ্রীমতী শিখা নন্দী এই বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ি। আমি গতকাল বিদ্যালয়ে আসতে পারি নি; কারণ সকালবেলা থেকেই অত্যন্ত মাথা ধরেছিল, চোখ লাল হয়ে গেল, একটু জ্বরের ভাবও ছিল।

আপনার নিকট তাই আমার বিনীত প্রার্থনা, আপনি অনুগ্রহ করে আমার গতকালের অনুপস্থিতি মার্জনা করবেন।

ইতি—

আপনার একান্ত অনুগতা ছাত্রী
শ্রীমতী শিখা নন্দী
ষষ্ঠশ্রেণী, গ শাখা
ক্রমিক নম্বর ১৫

বালীগঞ্জ সার্কুলার রোড,
কলিকাতা-১৯
১৩ই এপ্রিল, ১৯৭১

এইরকম চিঠিতে, যাঁকে চিঠি লেখা হচ্ছে তাঁর পরিচয় লিখতে হয়; তারপর সম্ভ্রমসূচক সম্বোধন মাননীয়া মহাশয়া (প্রধান শিক্ষককে মাননীয় মহাশয়); তারপর বক্তব্য; ইতির পর 'আপনার একান্ত অনুগতা ছাত্রী' (ছাত্র হলে—অনুগত ছাত্র) লিখে নিজের পরিচয়; বাঁ দিকে নিজের ঠিকানা এবং তারিখ লিখতে হবে।

প্রধান শিক্ষিকা শিখার দিকে একবার তাকালেন। শিখার শরীর এখন কেমন জিজ্ঞাসা করলেন। তারপর বললেন,

—এত ভালো ভালো খেলা হল, তুমি দেখতে পেলে না।

— শরীর অসুখ করল তাই আসতে পারি নি।

— খেলাধুলা তোমার ভালো লাগে ?

—খুব।

—কি কি খেল তুমি ?

— আমি ? আমি, আমি খেলি—

শিখা ঢোক চিপে গড়্ গড়্ করে কিছু একটা বলতে যাবে, এমন সময় প্রধান শিক্ষিকা কয়েকখানা ছবি বের করলেন। কেউ চাকা ছুঁড়ছে, কেউ দৌড়াচ্ছে, কেউ লাফ দিচ্ছে, কেউ কলসী মাথায় হেঁটে যাচ্ছে—এই সব ছবি।

আর একখানা ছবি বের করলেন। অনেকগুলো লোক তীর ধনুক নিয়ে একটা হরিণকে মারছে ; হরিণটা কিন্তু সত্যিকারের নয়, একটা পাথরে চক দিয়ে আঁকা।

প্রধান শিক্ষিকা জিজ্ঞেস করলেন—এগুলোকে খেলাধুলা বলা হয় কেন ? কত রকমের খেলাধুলা আছে ? খেলাধুলা করলে কি হয় ?

শিখা একটি প্রশ্নেরও উত্তর করতে পারল না। তিনি তখন আলমারী থেকে 'ছোটদের বিশ্বকোষ' বইটা তাকে দিয়ে বললেন,

—এর মধ্যে 'খেলাধুলার কথা' যেখানে লেখা আছে তা পড়ে ছোট করে একটা প্রবন্ধ লেখ, তবে তোমার ছুটি মঞ্জুর হবে।

শিখা আধঘণ্টা ধরে সেই অধ্যায় পড়ল। তারপর আরও আধঘণ্টায় একটা প্রবন্ধ লিখল। সেই প্রবন্ধ নীচে তুলে দিচ্ছি :

॥ জড় পদার্থ খেলাধূলা করে কিনা জানি না, কিন্তু যাদের জীবন আছে তারা খেলাধূলা করবেই। কুকুর খেলে, বিড়াল খেলে, ছোট ছোট বাছুর খেলে।

শরীর চালনা দিয়েই খেলাধুলা বুঝতে পারা যায়। কিন্তু পরিশ্রম করা আর খেলাধুলা করা এক কথা নয়। স্টেশনে যখন কুলিরা মালপত্র বয়ে নিয়ে চলে তখন সেটা শ্রম, খেলাধুলা নয়। অন্যের হুকুমে কিছু করা পরিশ্রম ; নিজের ইচ্ছায় যে শরীর চালনা করি তাই-ই খেলাধুলা। তাই ইস্কুলে ঘণ্টা মেপে যখন খেলতে বলা হয় তখন আমার ভালো লাগে না। ভাবতেই ক্লান্তি আসে।

কিন্তু খেলাধুলায়ও নিয়ম থাকে। ব্যাডমিণ্টন খেলা, ক্রিকেট খেলা, ফুটবল খেলা—এ সবেরই নিয়ম আছে। ইস্কুলের খেলাধুলায় এই নিয়মগুলোই বিশেষ করে শেখানো হয়।

ইস্কুলে আমরা পড়াশুনা করি, কিন্তু পড়াশুনা করতে অনেকের ভালো লাগে না, অথচ তারা গল্পের বই খুব পড়ে। এমন হয় কেন ? নিজের নিয়মে আর ইচ্ছায় পড়া আর অন্যের নির্দেশে পড়া বলেই এমন হয়। কিন্তু লেখাপড়া না শিখলে তো গল্পের বই পড়া যেত না। এইজন্য ইস্কুলে লেখাপড়া শেখানো হয়, যাতে পরে নিজের খুশীমতো অনেক কিছু আমরা পড়তে পারি।

খুকুর বয়স তিন বছর। সে খেলাধুলা করে। তাকে কেউ বলে দেয় না তবু সে খেলাধুলা করে। বড়দের কাজকর্ম সে খেলাধুলার মধ্য দিয়ে করে থাকে। সে বড়দের মতো হতে চায় বলেই এমনি খেলা খেলে। বড়দের মতোই সে কাজকর্ম শিখতে চায়। বিড়াল-ছানাকে নিয়ে মা-বিড়াল ইঁদুর ধরবার খেলা শেখায়।

প্রাচীন যুগের ছবিতে শিকারের খেলা আছে। তখন তারা পশু শিকার করে জীবনধারণ করত ; তাই পশু শিকার করা শিখতে হতো। জ্যান্ত পশুর সামনে কোন শিক্ষা দেওয়া বিপদজনক। এইজন্য পশুর ছবি এঁকে নিয়ে কোথায় তীর মারতে হবে, পশুকে কেমন করে কাবু করতে হবে—তাই শিখিয়ে দেওয়া হতো।

আড়াই হাজার বছর আগে খেলাধুলা করা একটা উৎসবের মতো ছিল। অলিম্পিয়া নগরীতে জিউসের মন্দির ছিল, সেখানেই এই উৎসবের সুরু। এই অলিম্পিক খেলা বন্ধ করে দেওয়া হল প্রায় হাজার বছর পর। বন্ধ করেছিলেন রোমের সম্রাট। রোম আর গ্রীস তখন পরস্পরের শত্রু। পরে শ চারেক বছর আগে এই খেলা পুনরায় সুরু হয়।

অলিম্পিকের খেলোয়াড়দের মধ্যে একজন খেলোয়াড় গ্রীসকে একবার যা বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন !

গ্রীসের রাজধানী ছিল এথেন্স। এথেন্সের কাছে একটি গ্রাম ছিল এটিকা। খৃস্টপূর্বাব্দ ৪৯০ সনের কথা। পারস্যের রাজা এটিকা আক্রমণ করলেন। গ্রীকদের সঙ্গে যুদ্ধ হল। একে বলে ম্যারাথনের যুদ্ধ। গ্রীকরা জিতল। এই সুখবর এথেন্সে কে পৌঁছে দেবে ? ট্রেন নেই, বেতার নেই তখন। অলিম্পিকের দৌড়বীর ফেইডিপিডিস বল্লেন, 'আমি পৌঁছে দেব।' ম্যারাথন থেকে এথেন্সের দূরত্ব ২৬ মাইল ৩৮৫ গজ। এই গোটা পথ ফেইডিপিডিস প্রচণ্ড বেগে দৌড়লেন। কিন্তু এথেন্সে পৌঁছে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন, প্রাণত্যাগ করলেন। খবর তিনি পৌঁছে দিলেন অবশ্য।

খেলাধুলা যারা করে তারা যে জাতির কতবড় কাজে লাগে এইতেই তার প্রমাণ। মানুষ হওয়ার জন্য, বড় হওয়ার জন্য, জীবিকা নির্বাহের জন্য, জাতির সেবায় লাগবার জন্য খেলাধুলার মধ্য দিয়েই শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়।

মহাভারতে কুরু-পাণ্ডবকে নিয়ে কত খেলাই না দ্রোণাচার্য করিয়েছেন, তবে তো তারা বীর হয়েছে !

কাজেই খেলাধুলা করাও শিক্ষার অঙ্গ। বিদ্যালয়ে তাই খেলাধুলা করা শেখানো হয়। যে-সব বিদ্যালয়ে খেলাধুলা শেখানো হয় না, সে-সব বিদ্যালয়ের কোন উৎসব আমার ভালো লাগে না।

আমাদের ইস্কুলের দিদিমণিরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের খেলাধুলা করতেও শিখিয়ে থাকেন ; আমার তাই খুব ভালো লাগে ॥

শিখার প্রবন্ধ প্রধান শিক্ষিকা পড়ে শিখার দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবলেন। তারপর বলেন, শেষের লাইনটি কেটে দাও।

—কেন দিদিমণি ?

—সামনের বছর ঐ লাইনটি লিখ।

শিখার ফাঁকি আর তোষামুদি দিদিমণি কিভাবে ধরতে পেরেছিল ?

॥ ৫৯ ॥

৩০ দ্বিজেন্দ্রলাল রায় রোড
কৃষ্ণনগর
নদীয়া
৭ই জুন, ১৯৭১

শ্রীচরণকমলেষু,

বাবা, আপনি গতকাল পুরী চলে গেলেন, কিন্তু আজকে খবরের কাগজে দেখলাম, আমাদের ইস্কুল আরও একমাসের জন্য বন্ধ থাকল ; পরীক্ষাও পিছিয়ে গেল।

হেডমাস্টারমশায়ের সঙ্গে আজ দেখা হয়েছিল। তিনি বললেন, 'ইস্কুল বন্ধ থাকল, কবে যে খুলতে পারব জানিনা। কিন্তু বাড়ীতে পড়াশুনা করবে।'

তিনি আমাকে কয়েকটা অঙ্ক করতে বলে গেলেন, আর কয়েকটা প্রবন্ধ। একটা প্রবন্ধ, 'উদ্বাস্তু' অন্যটি 'সমাজ ও সভ্যতা।'

'উদ্বাস্তু' সম্পর্কে আমি 'অনুশীলনে বাংলা ব্যাকরণ ও রচনার' ২৭ নম্বর পাঠ থেকে কিছু কিছু বুঝে নিয়েছি, বাকীটা এখন কৃষ্ণনগরে যা দেখছি সেগুলি সাজিয়ে লিখছি। 'সমাজ আর সভ্যতা' সম্পর্কেও এই বইয়ের ৯ নম্বর পাঠ থেকে কিছু পড়ে নিয়েছি। আর কোন্ কোন্ বই পড়তে হবে আমাকে জানাবেন।

আমরা সকলে ভালো আছি। আপনার কুশল জানাবেন। ইতি

প্রণত
শুভঙ্কর

পুনশ্চ : বাবা এবার এসে আমাকে কিন্তু একটা ছোট ক্যামেরা কিনে দেবেন। আমি ছবি তুলব।

ইতি শুভঙ্কর।

বয়সে বড় এবং যাঁদের প্রণাম করা উচিত তাঁদের কাছে চিঠি লিখতে সম্বোধনের সঙ্গে 'শ্রীচরণকমলেষু' লিখতে হয় ; ঠিকানাতে 'পরমপূজনায়' (মেয়ে হলে—পরমপূজনীয়া) লিখতে হয়।

শুভঙ্করের বাবা চিঠি পেয়ে, রচনা লিখবার জন্য আরও কয়েকটা বইয়ের নাম বলে দিলেন ; আর বললেন, 'ক্যামেরা' পাবে, তবে আলমারীতে একখানা পুরনো বই আছে, নাম 'আজব বই' ; সেই বই থেকে 'ছবি তোলা' প্রবন্ধটি পড়ে তুমি ছোট করে একটি রচনা লিখে রাখবে।

শুভঙ্কর সেই বই পড়ে যে-রচনাটি লিখল তা নীচে দেখ :

॥ পৃথিবীতে আলো যখন এসে পড়ে তখনই সব কিছু স্পষ্ট দেখা যায়। আলোর দিকে পিছন ফিরে দাঁড়ালে মুখে আর শরীরে থাকবে ছায়া। ছায়া-ই যেন ছবি হয়ে উঠছে। আলো দিয়ে যা দেখি তাই-ই ছবি।

ক্যামেরাতেও এই আলো-ছায়া ধরেই ছবি তোলা হয়। কিন্তু সাধারণ ক্যামেরায় নড়া চড়া তোলা যায় না। বিশেষ ধরণের ক্যামেরা এমন তাড়াতাড়ি ঐ আলো-ছায়ার অবস্থাকে তুলে ধরে যে, অত তাড়াতাড়ি আমাদের চোখ সে পার্থক্য ধরতে পারে না, তাই আমরা সিনেমায় নড়া-চড়া দেখি।

আলো আর তাপ এই সব মিলিয়ে ক্যামেরার যন্ত্রের নানা পরিবর্তন করা হয়েছে। 'ইনফ্রা রেডে'র ক্যামেরা, এক্স-রে ক্যামেরা সেই সব আলোক রশ্মি নিয়ে নানা ধরণের ছবি তুলছে। সেই ছবি ডাক্তারীতে, রোগ নির্ণয়ে কতই না কাজে লাগছে।

ক্যামেরার কাঁচকে বলে লেন্স ; এই লেন্স নানা রকমের। কতক্ষণ আলো ধরবে তারও নিয়ম আছে। যাতে ছবি তোলা হবে—সেই প্লেট বা ফিল্মেও নানা মসলা থাকে। সেগুলি বিশেষ নিয়মে কাগজে ছাপিয়ে নেওয়া হয়।

ক্যামেরার কারসাজিও কম নয় ; ভালো ছবিকে খারাপ করা, ছোট ছবিকে বড় করে তোলা, দ্রুত ছবিকে ধীরে তোলা—কত কাজ করে ক্যামেরা।

বিজ্ঞানের কাজে ক্যামেরা অনেক সাহায্য করছে। অগ্নেয়গিরির মধ্যে ঢুকে ছবি তোলা হচ্ছে, সাগরে ডুবে ছবি তোলা হচ্ছে, রঙিন ছবি তোলা হচ্ছে। এই তো সেদিন চাঁদের ছবি তুলে জগতের লোককে দেখানো হল।

কিন্তু ছবি তুলতে গেলে বিজ্ঞানের কিছু ধারণা থাকা চাই। সাধারণভাবে একটা ক্যামেরা কিনে নিয়ে গাছপালার ছবি তুলে তো তেমন মজা হয় না!

মজা না হলেও কতগুলো 'ইচ্ছে' মিটে যায়। আমি কোনারকের একটা ছবি দেখছি। বাবা পাঠিয়েছেন। বাবা একটি মন্দিরে পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। আমার মনে হচ্ছে,—আমি, মা, সত্য সবাই বাবার পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাবারই মতো সেই মন্দিরটা দেখছি। বাবা যে কাছে নেই তা কিন্তু মনেই হচ্ছে না।

ক্যামেরা তা হলে দূরকে নিকট করে দেয়, যা জানি না তাকে জানিয়ে দেয়, পুরাতনকে ভুলতে দেয় না॥

॥ ৬০ ॥

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর কর :

১। চিঠির সঙ্গে প্রবন্ধের পার্থক্য কি?

২। কি কি অংশ চিঠিতে থাকতেই হবে?

৩। প্রবন্ধ লিখতে হলে কি ভাবে সংবাদ সংগ্রহ করতে হবে?

৪। ৫০ নম্বর পাঠে জেট-প্লেন সম্পর্কে যে-কথা পড়েছ তার সঙ্গে তোমার মনের কথা যোগ করে ২০টি বাক্যে বিবরণ লেখ।

৫। তুমি কোন্ বিদ্যালয়ে পড়ছ? তার আশে পাশে কি কি রাস্তা আছে? বাড়ী থেকে তুমি বিদ্যালয়ে কি ভাবে যাও? তোমার বিদ্যালয়ে সরস্বতী পূজোয় কি ঘটেছিল?

৬। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কে ছিলেন? কোন্ কোন্‌টি তাঁর জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ? তাঁর জন্ম তারিখে তোমাদের বিদ্যালয়ে কি কি করা হয়?

৭। তুমি প্রথম কবে বিদ্যালয়ে গিয়েছ? ক্লাসে ঢুকে তোমার মনের অবস্থা কি হয়েছিল? কোন্ শিক্ষক বা শিক্ষিকা তোমাদের প্রথম ঘণ্টার ক্লাস নিলেন? তোমাদের আর কি কি তিনি বলেছিলেন?

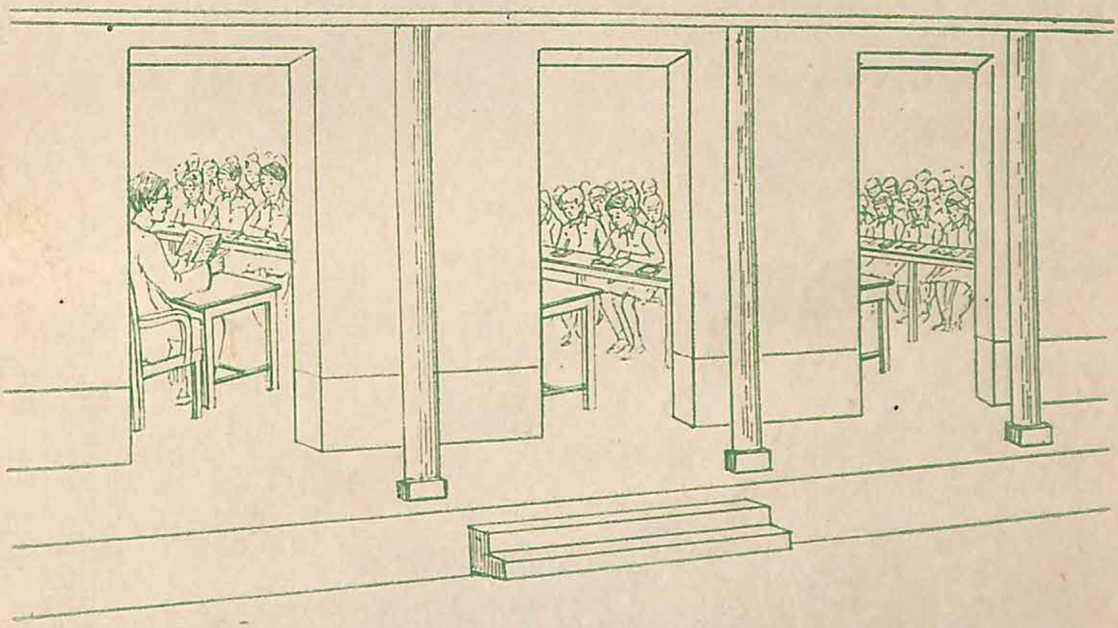
৮। এই গ্রীষ্মের বন্ধে তুমি কি কি কাজ করেছ? এই সব কাজ করতে তোমার কি কি সুবিধা বা অসুবিধা ঘটেছিল?

৯। 'সমাজ' সম্পর্কে একটা প্রবন্ধ লেখ।

১০। 'পরীক্ষা কবে হবে,' এই কথা জানতে চেয়ে তোমার বন্ধুকে চিঠি লেখ।

১১। 'তোমার শরীর অসুস্থ বলে স্কুলে যেতে পারছ না' এই কথা জানিয়ে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বা শিক্ষিকাকে একটি চিঠি লেখ।

১২। নীচের ছবিটিতে ইস্কুল বসেছে ; ইস্কুল বসবার লক্ষণ কি ? ইস্কুল ছুটি হলে কি অবস্থা হয় ? ইস্কুল বসা থেকে ইস্কুল ছুটি হওয়া পর্যন্ত একদিনের ঘটনা লেখ।



ROY : BENGALI GRAMMAR & COMPOSITION—WORKBOOK II

1972

Rs 4.00